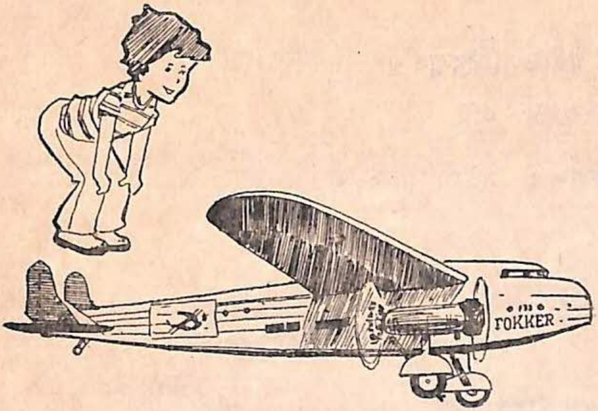
মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী



মাটি থেকে আকাশে



পার্থসারথি চক্রবর্তী

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

প্রকাশক :
রবীন বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনায়
প্রকাশিত ৮৮তম গ্রন্থ

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৮৪

মূল্য : দশ টাকা

প্রচ্ছদ : সঞ্জয় দে

মুদ্রাকর :
অশোককুমার চৌধুরী
দীপ্তি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৬

ভ্রম-সংশোধন ঃ

২৩ পাতার শেষ লাইনে লেখা হয়েছে ২২ পাতার ছবি দেখ—ওটা পড়তে হবে '১৯ পাতার ছবি দেখ'।

৪৮ পাতার ৮ লাইনে 'এরোপ্লেন' বানান ভুল আছে। ওটা ঠিক করে নিতে হবে।

ভূমিকা

আকাশকে নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। মানুষের জয় এখন সর্বত্র – স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে। এই বইতে বাংলার ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে খুব সহজ কথায় এরোপ্লেনের গল্প বলার চেষ্টা করেছি। গ্রন্থের কোনও কোনও স্থানে অবশ্য এ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর কিছু প্রাথমিক তথ্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে গেছে। শুধু যে সব ছেলেমেয়েরা ভাবী কালের পাইলট হবে তারাই নয় – বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যারা জ্ঞান ও আনন্দ পেতে চায়, তাদের কথা ভেবেই এই গ্রন্থ রচনা করেছি। এর সমস্ত লেখাই 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আমার ছোট কিশোর বন্ধুরা এই গ্রন্থ পড়ে আনন্দ লাভ করলে শ্রম সার্থক মনে করব।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ৬. ১২ ৮৩ পার্থসারথি চক্রবর্তী

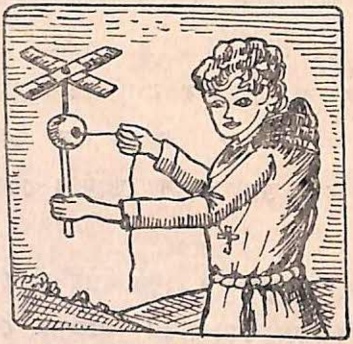
এতে আছে ঃ

আকাশে ওড়ার কল্পনা

ডিংকুর মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে, মেঘের ভেলায় ভেসে অথবা পাখীর মতো ডানা মেলে কতো দূর-দূরান্তরে চলে যায়। মার কাছে গল্প করে ডিংকু—ডানা মেলে সে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে কোন নাম-না-জানা দেশের উপর দিয়ে উড়ে যাবে কেমন করে। মা জিজ্ঞাসা করেন—কিন্তু রাত্তিরে যখন ঘুমোবার সময় হবে তখন কি করবে? ডিংকুর এবার স্পষ্ট জবাব—কেন, ডানা থাকবে তো আমার, তক্ষুণি আবার ডানা মেলে তোমার কোলের কাছে চলে আসবো!

শুধু ডিংকু কেন, যুগ যুগ ধরে মানুষ কল্পনা করে এসেছে—কেমন করে আকাশে পাখীর মতো ওড়া যায়। আজকের যে অতি আধুনিক ডিজাইনের উড়োজাহাজে চেপে আমরা হুস্ করে হাজার মাইল দূরে চলে যাই—সেটা কিন্তু আগেকার দিনে ততো সহজ ছিল না। এর পিছনের ইতিহাস গল্পের চেয়েও অদ্ভুত! সব চেয়ে মজার কথা আগেকার দিনের অনেক বিজ্ঞানীর খুব সখ ছিল একটি কাল্পনিক উড়োজাহাজের ডিজাইন এঁকে নিয়ে তার মডেল তৈরী করা। এটা শুধু তাঁদের খেলনা এরোপ্লেন নিয়ে সারাবেলার হেলা-ফেলা খেলাই ছিল না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে যখন সাধারণ হাতের কাজের যন্ত্রপাতিই ভালো করে আবিষ্কার হয়নি—সেই সময় এই সব বিজ্ঞানীরা কেমন করে উড়োজাহাজের মডেল বানানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন! মানুষের আকাশে ওড়ার কল্পনার প্রথম ছবি দেখতে পাওয়া যায় ফ্লেমিশের পাণ্ডুলিপিতে। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে আঁকা এই মডেলটি এখন কোপেনহেগেনের রয়্যাল লাইব্রেরীতে রয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে যে ড্রইং আঁকা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে একজন পাদ্রীর হাতে একটা ঘূর্ণায়মান যন্ত্র। এটা একটা সূতো দিয়ে সহজেই ঘুরানো যায় আর তখন যন্ত্রের সামনের

চাকা উপরের দিকে ঠেলা মারে। আমাদের দেশে এখনও রথের মেলায় অনেকে এই রকম টিনের খেলনা তৈরী করে ছেলেমেয়েদের কাছে বিক্রী করে। এটাকে প্রথম হেলিকপ্‌টারের মডেল বলা চলে।



ফ্লেমিশের মডেল হেলিকপটার

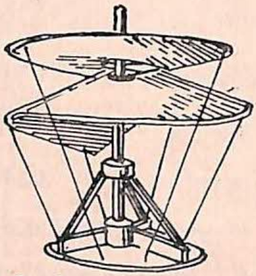
এখন যাঁরা এরোপ্লেন চালান তাঁদের ভারী মজা—তাই না? মাথার ওপরে সীমাহীন নীল আকাশ আর নীচে নয়নাভিরাম নীল সমুদ্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তাঁদের আশ যেন আর মেটে না। দিগন্ত উদ্ভাসিত করে উষার সূর্যোদয় ও গোধূলির সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য রূপ শুধু পাইলটকেই নয় তার আরোহীদেরও মুগ্ধ করে। মানুষ কি করে বুদ্ধি খাটিয়ে আকাশকে জয় করল—তার গল্পই আজ তোমাদের কাছে বলব।

মডেল নিয়ে আরও মাথা ঘামানো

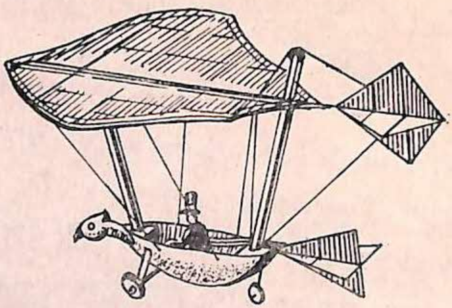
বিখ্যাত শিল্পী, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উড়োজাহাজের একটা কাল্পনিক মডেল এঁকেছিলেন ১৪৮০ সালে। তাঁর মডেলে একটি প্যাঁচানো পাখা রয়েছে যেটা সহজেই বাতাসে গুটিয়ে যেতে পারে। রেঁনেসা যুগের অসাধারণ প্রতিভাবান লিওনার্দো যদি কেরোসিন, পেট্রোল অথবা ঐ ধরনের কোনও জ্বালানী দিয়ে তাঁর পাখাকে ঘুরাতে পারতেন তাহলে এই মডেলের কাছে আজকের অতি আধুনিক VTOL উড়োজাহাজও চারশো বছর আগে পুরনো হয়ে যেত। VTOL-শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Vertical take off and landing—এর কথা আমরা পরে আলোচনা করছি।

১৮০৪ সালে স্যার জর্জ ক্যালে যে চমৎকার উড়োজাহাজের মডেলটি তৈরী করেছিলেন সেটা দেখতে অবিকল আমাদের আধুনিক গ্লাইডারের মতো। স্যর জর্জ ক্যালে ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। তাঁর তৈরী উড়োজাহাজের এই মডেলটিকে কেউ কেউ আধুনিক এরোপ্লেন ডিজাইনের প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করেন। এর পরে অবশ্য ১৮৫৩ সালে ক্যালে তাঁর এই মডেলটির সংস্কার ক'রে আর একটি উড়োজাহাজের মডেল তৈরী করেন। এটাও চমৎকার উড়তে পারতো।

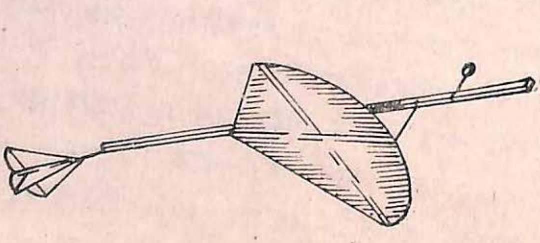
এরপর এলেন উইলিয়াম স্যামুয়েল হেনসন। সেটা ১৮৪২ সালের কথা। হেনসন ও তাঁর সহকর্মীরা উড়োজাহাজের মডেলকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এঁরা শুধু উড়োজাহাজের মডেল তৈরী করেই থেমে থাকলেন না। উড়োজাহাজ আকাশে উড়ে বেড়াবার মূলতত্ত্বও অনেকখানি বুঝতে পারলেন। এই মডেলে ছিল খুব হাল্‌কা একটি ষ্টীম এঞ্জিন—যেটা উড়োজাহাজের ডানা দুটোকে সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত।



লিওনার্দো দা ভিঞ্চির উড়োজাহাজের মডেল। লক্ষ্য কর, মেসিনটি কেমন খাড়া অবস্থায় উড়তে পারে।



স্যার জর্জ ক্যালের উন্নত ধরনের মডেল যা নাকি মানুষকে নিয়ে উড়তে পারবে।



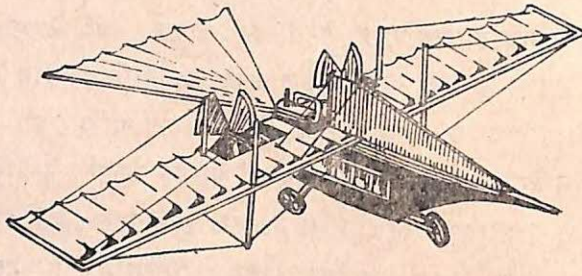
আধুনিক এরোপ্লেনের প্রথম রূপ।

১৮৫০ সালে পিনাউড নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক আর একটা উড়োজাহাজের মডেল তৈরী করেছিলেন। এই উড়োজাহাজের ডানায় হাল্কা তারের বুনানী ছিল এবং তলার দিকে টান টান করে বাঁধা রবারের ব্যাণ্ড থেকে মডেলটি তার উড়বার শক্তি পেত। শোনা যায় পিনাউডের এই মডেলটি প্রায় দু'শো ফুট উঁচুতে উড়েছিল—যা নাকি তার আগে একশো ত্রিশ বছরের চেষ্টাতেও কেউ পারেনি। কেন যে ভদ্রলোক এর নাম দিয়েছিলেন 'এরোফোন' তা অবশ্য জানা যায়নি।

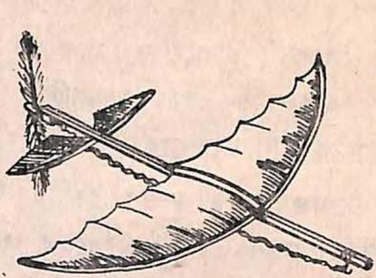
উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তানস্কি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে একটি সুন্দর উড়োজাহাজের মডেল তৈরী করেছিলেন। এর লেজটা (এলিভেটর) বাঁকানো এবং আগের মতন রবারের ফালি থেকে শক্তি পেয়ে মডেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যেত খোদাই করা কাঠের দুটো প্রপেলার।

এর পর উড়োজাহাজের মডেল তৈরীর ইতিহাসে যাঁর নাম আমরা পাই তিনি হচ্ছেন একজন কলেজের প্রফেসর। এঁর নাম ল্যাংগলি। প্রফেসরের তৈরী এই মডেলটি তাঁর বাড়ীর বাগানের উপর দিয়ে চমৎকার উড়ে গিয়েছিল। সব চাইতে মজার কথা এর পাখ্না দুটো—একটা আর একটার পিছনে বসানো ছিল। পিছনের লেজটিও এর নতুন ধরনের বলা যেতে পারে। উড়োজাহাজের একেবারে সামনে রয়েছে দুটো কাঠের প্রপেলার। এটাও অবশ্য রবারের ব্যাণ্ড থেকে শক্তি পেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেত।

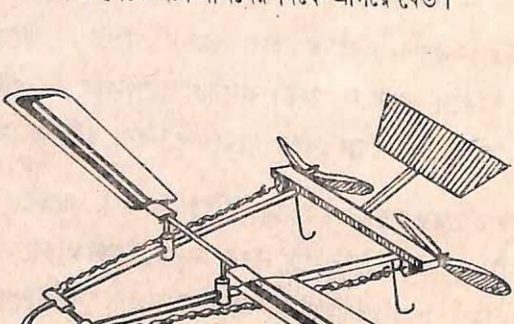
উড়োজাহাজের মডেল তৈরীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম হ'ল স্যর সিডনী ক্যাম। ইনি শুধু নতুন নতুন উড়োজাহাজের মডেলই তৈরী করেননি—বিখ্যাত হাণ্টার, হ্যারিকেন এবং ফ্যুরি উড়োজাহাজের ডিজাইনও ইনি তৈরী করেছিলেন। সিডনি ক্যাম ছিলেন উইণ্ডসর মডেল এরোপ্লেন ক্লাবের একজন করিৎকর্মা ব্যক্তি। সারাটা জীবন তিনি ব্রিটিশ এয়ার ক্রাফ্ট ইণ্ডাস্ট্রীতে কাজ করে গেছেন। এখনও



স্যামুয়েল হেনসন ও তাঁর সহকর্মীদের হালকা স্টীম এঞ্জিন চালিত উড়োজাহাজের মডেল।

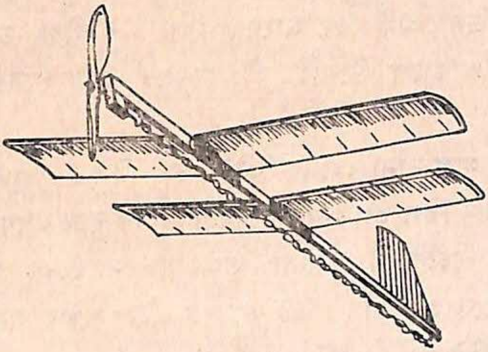


পিনাউডের তৈরী মডেল এরোফোন। রবারের ফালি থেকে শক্তি পেয়ে এটা সামনের দিকে এগিয়ে যেত।

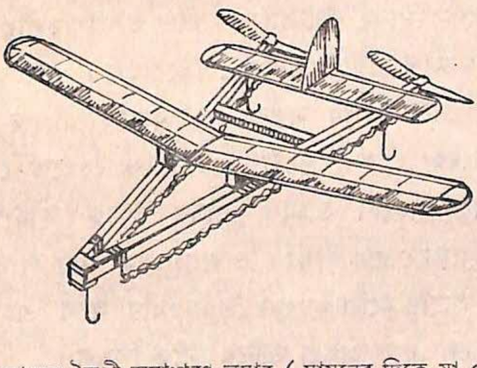


তানস্কির মডেল এরোপ্লেন। লক্ষ্য কর, রবারের ব্যাণ্ডের পেছনে রয়েছে দু'টো প্রপেলার আর এর লেজটিও কেমন বাঁকানো।

হেনডনের রয়্যাল এয়ার ফোর্স মিউজিয়ামে গেলে দেখা যাবে সিডনি ক্যাম তাঁর তৈরী উড়োজাহাজের একটি মডেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন !



প্রফেসর ল্যাংগলির মডেল ।



সিডনী ক্যামের তৈরী অসাধারণ লুসার (সামনের দিকে যা ঠেলা দিলে এগিয়ে যায়) মডেল । সিডনি ক্যাম এটি তৈরী করেন ১৯১২ সালে ।

মানুষকে টেক্কা দিল কীটপতঙ্গ

পৃথিবীর আকাশে সর্বপ্রথম উড়ে বেড়ায় কীটপতঙ্গের দল। এটা প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগের কথা। পাখীরা তাদের ডানায় ভর দিয়ে আকাশে উড়েছে কীটপতঙ্গের প্রায় পনের কোটি বছর পরে।

আদিম যুগে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ ছিল। এদের তখনকার চেহারা কেমন ছিল তা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে! এখনকার কীটপতঙ্গের চেহারার তুলনায় তখনকার মাছিদের আকার ছিল অনেকটা দৈত্যের মতো। এই ভয়াবহ কীটপতঙ্গের অনেকেই ছিল ত্রিশ সেন্টিমিটারের বেশী লম্বা। এদের পাখনার সাইজও ছিল বিরাট। প্রায় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার লম্বা, অর্থাৎ একটা ছোট্ট কুমীরের বাচ্চা যতটা লম্বা, অনেকটা সেইরকম আর কি।

সৃষ্টির প্রথম দিকে কীটপতঙ্গের ঘাড় ও পাকস্থলীর মধ্যবর্তী অঙ্গ থেকে কিছুটা অংশ বাইরের দিকে বেরিয়েছিল। দেহের এই বেরিয়ে থাকা অংশ থেকেই খুব সম্ভবত পরে বাঁচার তাগিদে পাখনার সৃষ্টি হয়েছে। এদের পাখনা দুটোর চেহারাও দেখতে যেন অবিকল গ্লাইডার প্লেনের দুটো ডানা। প্রথম দিকে কীটপতঙ্গেরা এই পাখনার সাহায্যে ভেসে থাকতে ও লম্বা লাফ দিতে পারতো। পরে অবশ্য জটিল কব্জার মতো পাখনা তৈরী হবার ফলে এরা ইচ্ছামতো পাখনাকে মেলে দিতে অথবা গুটিয়ে নিতে শিখল।

পাখী, বাদুড় প্রভৃতির ক্ষেত্রে ডানাকে বলা চলে বাহুর পরিবর্তিত সংস্করণ। যখন এইসব প্রাণীরা উড়তে শিখল তখন আস্তে আস্তে এদের পা ও বাহুর ব্যবহার বেশ কিছুটা সীমিত হয়ে এল। কিন্তু কীটপতঙ্গের বেলায় পাখনা গজানোর পরেও তাদের বাহু ও পায়ের ব্যবহার ততটা সীমিত হয়নি!

মাছি যখন উড়ে বেড়ায় তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ ও সাহায্য করে

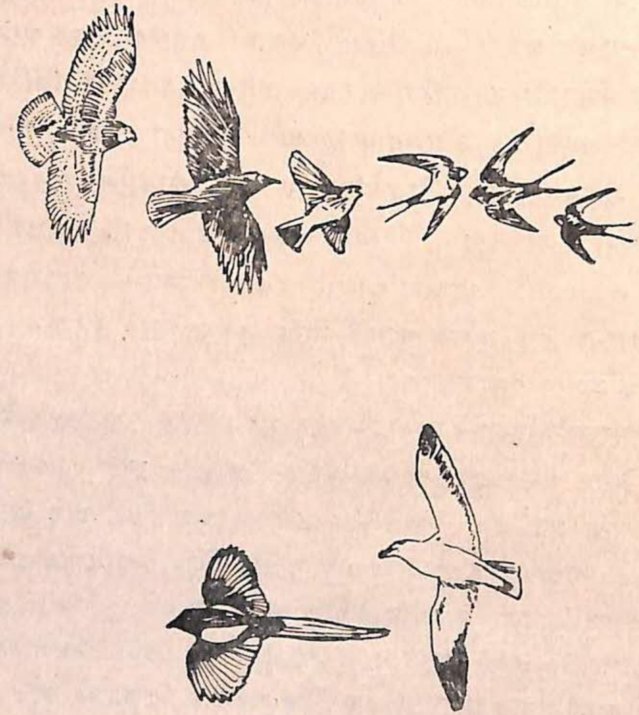
পেছনের দুটো পাখনা। মাছির প্রত্যেক পাখনার নীচে একজোড়া করে সুস্থিত অংশ (stabilizer) থাকে। এগুলো দেখতে অনেকটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠির মতো। এই রডের মতো জিনিসটার মাথায় একটা ছোট্ট বলের মতো ওজন চাপানো থাকে। পাখনার সঙ্গে সমান তালে এটিকে কাঁপিয়ে মাছি আকাশে তার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। জিনিসটা দেখতে আসলে কি অসম্ভব রকম ছোট তা বোধহয় তোমরা আন্দাজ করতে পেরেছ। রডের মাথায় আটকানো এই বলের জন্যেই মাছি বুঝতে পারে তাকে কতখানি ঝুঁকতে অথবা এগুতে হবে।

সমস্ত কীটপতঙ্গের মধ্যে নিজেকে সব চাইতে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে উড়তে পারে এক ধরনের মাছি—হোভার ফ্লাই। এক এক সময় মনে হয় এরা উড়ছে না—এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাছির দেহ থেকে এগুলি সরিয়ে নিয়ে দেখা গেছে যে সে তার ভারসাম্য মোটেই বজায় রাখতে পারছে না।

ব্যাপারটা একটু সহজ করে বুঝা যাক্। একটা দেশলাইয়ের বাক্সের কাঠি রাখার ড্রয়ারকে এক ইঞ্চি বাইরের দিকে বের করে এক হাত ওপর থেকে নীচের দিকে ফেলো। যখন ওটা টেবিলে অথবা সিমেণ্টে এসে ধাক্কা মারবে তখন ঐ বাক্সের ড্রয়ারের ভরবেগের জন্য দেশলাইটা প'ড়ে না গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরোপ্লেন, টর্পেডো প্রভৃতিকে এই একই নিয়মে চালানো হয়। দেশলাই বাক্সর দাঁড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য শুধু এই যে এখানে দ্রুত পাখা ঘুরিয়ে ভরবেগ উৎপন্ন করা হয়।

কীটপতঙ্গের একজোড়া অথবা দু'জোড়া পাখনা থাকে। মৌমাছির সামনের পাখনার সঙ্গে পিছনের পাখনা ক্ষুদ্র হুকের মতো এক রকম জিনিষ দিয়ে আটকানো রয়েছে। প্রজাপতি এবং অনেক মথের সামনের পাখনা পিছনের পাখনার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।

হেলিকপটারের ব্লেড ঘুরলে যেমন সে যেতে পারে এগিয়ে,



নানারকম পাখি কেমন করে আকাশে ডানা মেলে উড়ছে—ছবিতে দেখ।



অটোলিলিএনথালের তৈরী উড়োজাহাজ। ১৪ পৃষ্ঠায় এর
আলোচনা করা হয়েছে।

কীটপতঙ্গও তেমনি পাখনাকে কাঁপিয়ে উপরে উঠতে অথবা নীচে নামতে পারে। হেলিকপটারের ক্ষেত্রে যেমন তার ব্লেডগুলো বন্‌বন্‌ করে ঘোরে, কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম হয় না। পাখ্‌নাকে একবার উপরে ও আর একবার নীচে নামিয়ে বাতাস কেটে তারা এগিয়ে যেতে পারে।

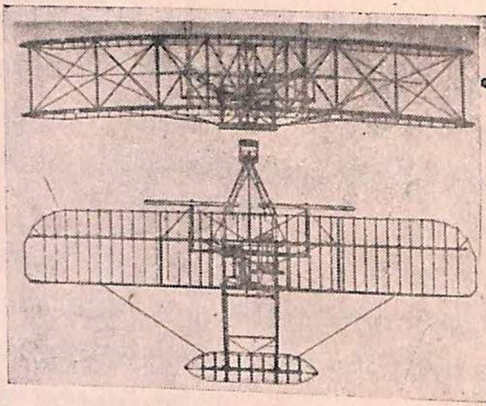
বুকের মাংসপেশী থেকেই কীটপতঙ্গ তার উড়বার শক্তি পায়। কীটপতঙ্গের এই মাংসপেশীর শক্তি অবশ্য সবার ক্ষেত্রে এক নয়। বুকের এই পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ এত দ্রুত গতিতে ঘটে যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। পেশীর সংকোচন ও প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে কীটপতঙ্গ সেকেণ্ডে তার পাখ্‌নাকে কুড়ি থেকে হাজার বার পর্যন্ত ওঠা নামা করাতে পারে। কোনও কোনও পাহাড়ে-মৌমাছি অতি দ্রুত তার পাখ্‌না কাঁপিয়ে ঘণ্টায় ছাপ্পান্ন মাইল বেগে পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে।

কীটপতঙ্গের আকাশে ওড়ার ব্যাপারটা যেমনি সুন্দর ঠিক তেমনই বৈজ্ঞানিক বিস্ময়! কতকগুলি কীটপতঙ্গ তাদের আলগা (জুড়ে না থাকা) সামনের ও পিছনের পাখ্‌না জোড়াকে স্বাধীনভাবে কেমন করে নাড়াতে পারে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়াও মুস্কিল।

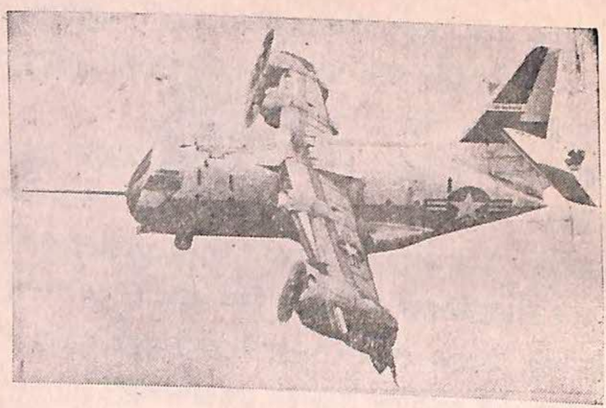
সরীসৃপরা উড়তে পেরেছিল আট কোটি বছর আগে। প্রথম স্তন্যপায়ী যে প্রাণী আকাশে উড়েছিল সে হচ্ছে বাদুড়।

সরীসৃপ থেকে পাখীর জন্ম হল। এখন যে সব পাখী আমাদের চোখে পড়ে তারা পৃথিবীতে উড়ে বেড়াচ্ছে সত্তর লক্ষ বছর আগে থেকে।

পাখীকে নীল আকাশের বুকে মনের সুখে ভেসে বেড়াতে দেখে মানুষের খুব হিংসে হতো। সেও চাইত আকাশে উড়তে। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী এবং উপকথায় মানুষের এই গোপন ইচ্ছার কথা জানা যায়। মিশরের দেবী আইসিস তাঁর ভক্তদের ডানার নীচেয় রেখে রক্ষা করতেন। প্রাচীন কালের অনেক লেখা ও ছবিতে দেখা যায় দেবদূতেরা ডানা মেলে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসছেন।



রাইট ভাইদের তৈরী উড়ো জাহাজ—১৯০৩।



বোমারু বিমান

ভারতীয়, চীনা এবং স্কানডিনেভিয়ান উপকথাতেও অনুরূপ মূর্তির কথা বলা হয়েছে।

গ্রীক পুরাণ অনুসারে জানা যায় এথেন্সের বিজ্ঞানী ডাডিলাস একসময় আকাশে উড়তে পেরেছিলেন। তিনি যখন ক্রীট দ্বীপে বন্দী ছিলেন তখন তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ডানা মেলে উড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

মোনালিসার বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি, যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে তিনি কেবলমাত্র শিল্পীই ছিলেন না। দার্শনিক

এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি পাখীরা কিভাবে আকাশে উড়ে বেড়ায় এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন খুব। ১৪৯০ খৃস্টাব্দে লিওনার্ডো মন্তব্য করলেন (যদিও সেটা ঠিক নয়)— পাখীরা তাদের ডানা ঝাপটানোর ফলেই আকাশে উড়তে পারে।

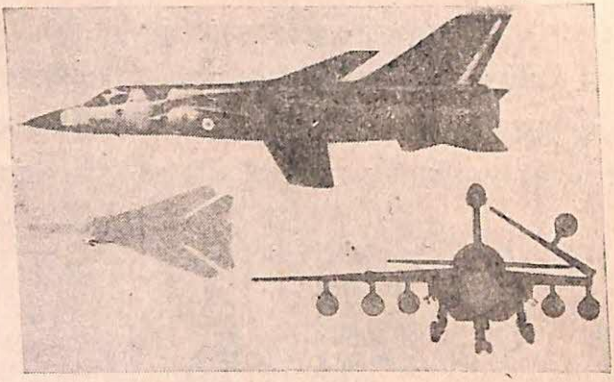


গ্রীক পুরানের ডাডিলাস আকাশে উড়ে তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

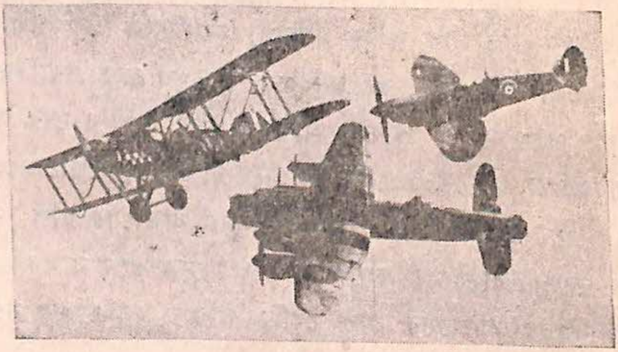
অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইস বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বারনৌলি একটি ছোট্ট ঘটনা আবিষ্কার করেন। বাতাস খুব দ্রুত প্রবাহিত হলে তার চাপ কমে যায়। পাখীরা আকাশে উড়বার সময় তার ডানার নীচের তলের চাইতে উপরের তল দিয়ে বাতাস খুব জোরে বেরিয়ে যায়। এর ফলে ডানার দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ ডানার নীচের তলের বাতাসের চাপের চাইতে অনেক কমে যায়। তখন ডানার নীচের বাতাসের চাপ বেশি থাকায় পাখী খুব সহজেই আকাশে ভেসে থাকতে পারে।

স্যার জর্জ ক্যালেকে বলা হয়—ফাদার অব্ দ্য এরোনটিক্স। পাখীরা ঠিক কি ভাবে আকাশে ওড়ে এ নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। জর্জ ক্যালে প্রমাণ করলেন—বাতাসে ভর দিয়েই পাখী আকাশে উড়তে পারে, ডানা ঝাপটিয়ে নয়।

ফরাসী ভদ্রলোক ক্লিমেণ্ট এডারই প্রথম বাদুড়ের মতো দেখতে উড়োজাহাজ বানিয়েছিলেন ১৮০৯ খৃস্টাব্দে। স্টীম চালিত এই উড়োজাহাজটি সত্যিই মাটি থেকে আকাশের অনেকটা উপরে উঠেছিল জলজ্যান্ত একজন মানুষকে নিয়ে।



উপরে মিরেজ জি-৮ ফাইটার বিমান যা ঘণ্টায় ১৬৫০ মাইল বেগে উড়তে পারে। নীচে ডানদিকে আমেরিকান গ্রুমান এড এ্যাটাক উড়োজাহাজ। যে বিমান নিজের খুশীমতো ডানা মেলতে এবং গুটিয়ে নিতে পারে।



প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ব্রিস্টল বিমান স্পিট ফায়ার এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ্যাভ্রো বোম্বার।

অটোলিলিএনথালের কিন্তু উড়োজাহাজের এঞ্জিনের উপর ভরসা ছিল না মোটেই। তিনি যে গ্লাইডারটা তৈরী করেছিলেন সেটা হাত পা নেড়ে মানুষই চালাতে পারত। তিনি বেশ কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত ১৮৯৬ সালে এক প্রচণ্ড দুর্ঘটনায় তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়।

এঞ্জিনের সাহায্যে প্রথম আকাশে উড়েছিলেন উইলবার এবং অরভিল রাইট। ১৯০৩ সালের সতেরই ডিসেম্বর তাঁরা নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহকের উপর প্রায় একমিনিট উড়ে থাকতে পেরেছিলেন।

এরপর লুই ব্লেরিওট তাঁর নিজের ডিজাইনে তৈরী উড়োজাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন। সেটা ১৯০৯ সালের কথা।

কমার্সিয়াল এরোপ্লেন প্রথম তৈরী করেছিলেন ফ্রান্সে ভয়সিন ব্রাদার্স এবং ইংল্যাণ্ডে সর্ট ব্রাদার্স। ভ্য মনোকোক ডেপার ডুসিনই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম দ্রুতগামী বিমান যা নাকি ঘণ্টায় ১২৪ মাইল বেগে উড়তে পেরেছিল।

তারপর এল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। কারখানায় দিনরাত তৈরী হতে লাগল নানাধরনের ফাইটার ও বম্বার বিমান। বিমানের নতুন মডেলও তৈরী হলো অনেক। সত্যি কথা বলতে কি পর পর দুটো বিশ্ব মহাযুদ্ধের ফলেই উড়োজাহাজের ডিজাইনের ইতিহাসে আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে! জেট এঞ্জিনও এই সময়েই তৈরী হয়েছিল। এই এঞ্জিনের ভিতরের কাজ-কর্মের ব্যাপারটিও অতি সাধারণ। এঞ্জিনের পিছন থেকে গরম গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে উড়োজাহাজকে সামনের দিকে ঠেলে দিত! সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে এরপর তৈরী হ'ল—মিরেজ বিমান, যা নাকি ঘণ্টায় ১,৬৫০ মাইল বেগে ছুটতে পারে! আমেরিকার গ্রুমান-এ-সিক্স এ্যাটাক বিমান এল ঠিক এর পরে। আবার অবাক কাণ্ড করে বসল মানুষ—হেলিকপটার তৈরী করে। হেলিকপটার সোজা উপরে উঠতে পারে, নীচে নামতে পারে। এছাড়া সোজাসুজি এগুতে, পিছুতে যে দিকে খুশী যেতে পারে। যদিও উদ্ধারকাজেই হেলিকপটারকে বেশী ব্যবহার করা হয়েছে তবু যুদ্ধেও এর কেরামতি কিছু কম নয়। হেলিকপটারের মাথার উপরে বিরাট পাখার মতো যে ব্লেডগুলো ঘুরতে থাকে সেগুলিকে উড়োজাহাজের ডানার মতো করে তৈরী করা হয়। এই ব্লেডগুলোর কোণ (এ্যাঙ্গল) পাল্টিয়ে পাইলট হেলিকপটারের

গতিকে কমাতে অথবা বাড়াতে, উপরে উঠতে বা নীচে নামতে পারে। কনকর্ডই হচ্ছে সর্বপ্রথম সুপারসোনিক যাত্রীবাহী বিমান। শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে এই বিমান চলে।

রামায়ণ মহাভারতের যুগে কি আকাশযান ছিল ?

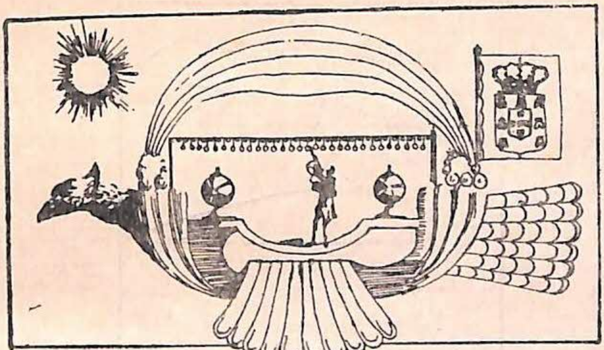
তোমরা রামায়ণে পড়েছ রাবণ সীতাকে হরণ করে পুষ্পক রথে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই পুষ্পক রথ জিনিষটা আসলে কি ? এটা কি আজকের দিনের এরোপ্লেনের মতো একটা কিছু পরিবহণ যন্ত্র ছিল ? ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে প্রায় তিন-চার হাজার বছর আগে যখন বিজ্ঞানের উন্নতিই হয়নি ভাল করে—তখন এই ধরনের উন্নত পরিবহণ যন্ত্র আসবে কোত্থেকে ?

রামায়ণে লেখা আছে যে ধনী 'কুবের'-এর আকাশ পথে ভ্রমণ করার একটি যান ছিল। এর নাম 'পুষ্পক'। রাবণ রাজা কুবেরের কাছ থেকে জোর করে এই পুষ্পক রথ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এই পুষ্পক রথকে আকাশ পথে খুশীমতো ঘুরানো যেত—দিক পরিবর্তনও এর করা যেত অতি সহজেই। অনেক কলকব্জাও নাকি এই পুষ্পক রথে ছিল।

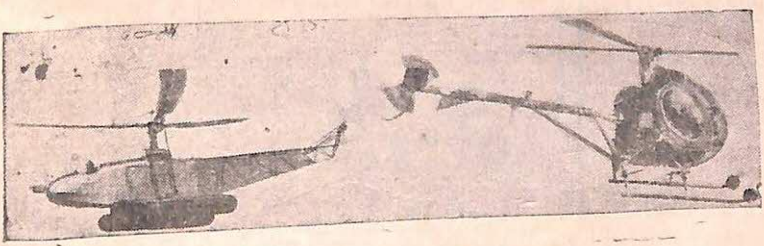
রাবণ শূর্পনখার নাক কাটা গেলে রামের দণ্ডকারণ্যের আস্তানা দেখতেও এসেছিলেন এই পুষ্পক রথে চড়ে। রাবণের একজন চালক (পাইলট) এটা চালিয়ে এনেছিলেন। সাগর পেরিয়ে আসবার সময় রাবণ অনেক ছোট ছোট রাজ্যে এই ধরনের আরো বিমান দেখেছিলেন। রঘুবংশেও বিমানের কথা আছে।

মহাভারতেও বিমানের উল্লেখ করা হয়েছে। এর নাম সৌভ বিমান। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রেও বিমানের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ঋষি ভরদ্বাজের 'বৈমানিক শাস্ত্র' ছিল একটি বিখ্যাত যন্ত্র চালিত আকাশ-যান। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও কি তাহলে বিমান আকাশে উড়ত ? সম্ভবতঃ এগুলো নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আগেই বলেছি যে পাখীকে উড়তে দেখেই মানুষের আকাশে ওড়ার সাধ জাগে। অনেক অনেক কাল আগে যখন উড়োজাহাজ আবিষ্কার হয় নি তখন মানুষ কল্পনা করতো পাখীর পিঠে চড়ে সে কেমন চাঁদের দেশে উড়ে চলেছে। গুসমাও-এর ১৭০৯ সালে আঁকা বিখ্যাত 'প্যাসা রোলা' ছবিটা দেখলেই তোমরা তো বুঝতে পারবে।



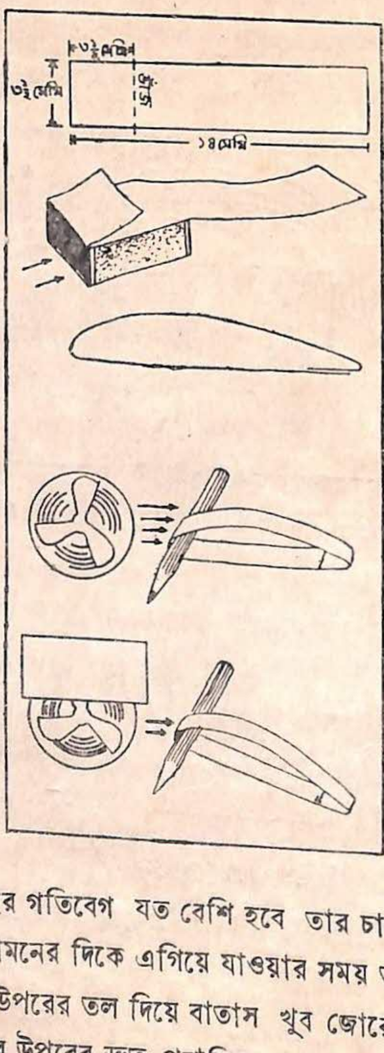
১৭০৯ সালে আঁকা প্যাসা রোলা ছবি।



বিভিন্ন ধরণের হেলিকপটার।

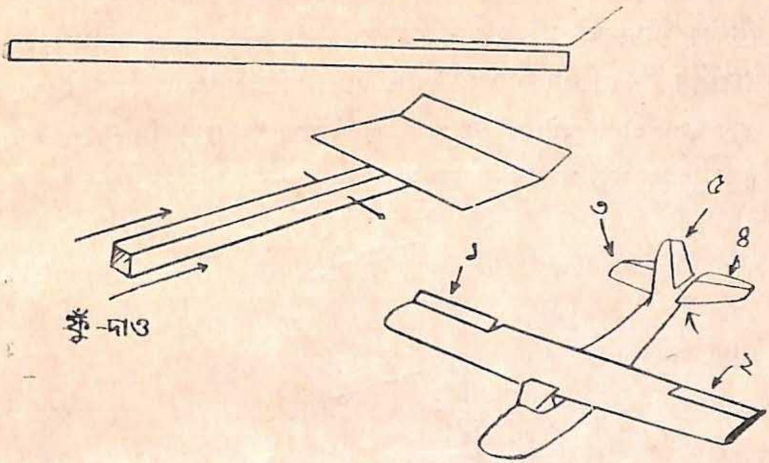
বিভিন্ন পাখীর ডানার গঠনে পার্থক্য আছে। চড়ুই, বাজ, শকুন, ঈগল প্রভৃতি পাখীর ডানার ছবি এঁকে তা দেখতে পারো। পাখীর ডানার গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী কালে উড়োজাহাজের

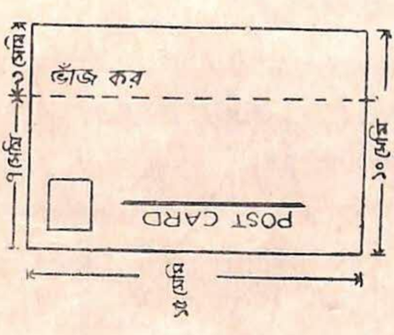
বিভিন্ন মডেল তৈরী হয়েছে। পাখী শুধু তার ডানা ঝাপটায় বলেই উড়তে পারেনা—একথা তোমরা জান। কিভাবে উপরে উঠে আকাশে ভেসে থাকা যায় তা আবিষ্কার করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সুইস বিজ্ঞানী ডানিয়েল বারনৌলি। যখন কোনও বাতাস অথবা কোনও গ্যাস বা কোনও তরল পদার্থ দ্রুত প্রবাহিত হয়, তখন তার চাপ কমে



যায়। প্রবাহের গতিবেগ যত বেশি হবে তার চাপও তত কমবে। উড়োজাহাজ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার ডানার নীচের তলের চাইতে উপরের তল দিয়ে বাতাস খুব জোরে বেরিয়ে যায়। এর ফলে ডানার উপরের দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ ডানার নীচের

তলের বাতাসের চাপের চাইতে অনেক কমে যায়। তখন ডানার নীচের বাতাসের চাপ বেশী থাকায় ঐ ভারী প্লেনটা খুব সহজেই ভেসে থাকতে পারে। উড়োজাহাজই হোক অথবা পাখীই হোক, আকাশে ওড়ার এটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা। এস, আমরা

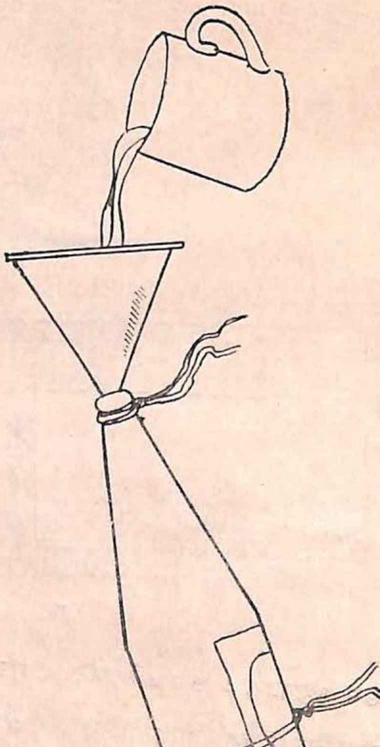




১ ও ২ এইলেরন, ৩ ও ৪ এলিভেটর, ৫ রাডার

একটা মজার এক্সপেরিমেণ্ট করে বারনৌলির এই আবিষ্কারকে বুঝতে চেষ্টা করি। এতে যন্ত্রপাতিও বিশেষ লাগবে না। আমাদের দরকার হবে ১৪ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৩২ সে.মি. চওড়া এক ফালি কাগজ, একটা দেশলাইয়ের বাক্স আর কিছু আঠা।

কাগজের ফালিটা নিয়ে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম ওটার পিছন দিকে ৩½ সে মি. অংশ ভাঁজ করে নাও। এইবার ভাঁজ করা অংশটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে বাকী অংশটা আঠা দিয়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্সের উপরে জুড়ে দাও। এইবার কাগজের ফালির ভাঁজ করা জায়গার দিক থেকে জোরে ফুঁ দাও। দেখবে, সামনের বেরিয়ে থাকা কাগজের ফালিটা ওপরের দিকে ঠেলা দিচ্ছে। কাগজের ফালির উপরে বাতাসের চাপ কম। তাই নীচের বাতাসের চাপে ওটাকে উপরের দিকে ঠেলা দিচ্ছে! এইজন্যে ওটা ভেসেও থাকতে পারবে—পড়ে যাবে না।

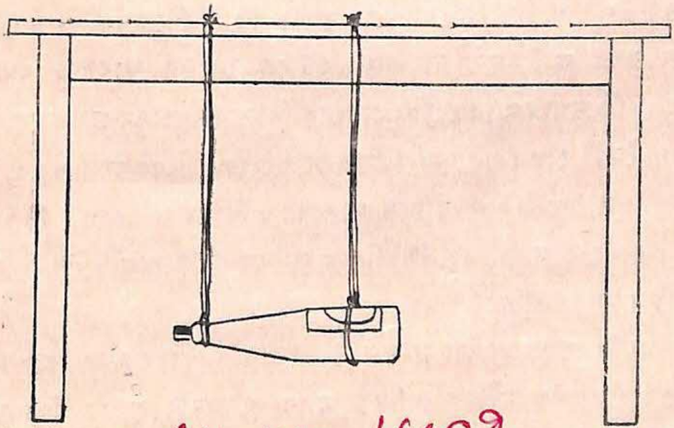


ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটনা বুঝতে হলে এই দারুণ মজার এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখ।

বারনৌলির আবিষ্কারকে আরও একটা সহজ এক্সপেরিমেণ্ট করে বুঝা যায়। একটা মোটা কাগজ (ত্রিশ সে.মি. লম্বা ও পাঁচ সে.মি. চওড়া) কাঁচি দিয়ে কেটে সেটার মুখ দুটোকে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে আঠা দিয়ে জোড়। দেখবে কেমন সুন্দর অনেকটা এরোপ্লেনের ডানার মতো একটা অংশ (লুপ) তৈরী হয়ে গেল। এবার একটা পেন্সিল ওই লুপের মধ্যে ঢুকিয়ে ওটাকে একটা টেবিল পাখার সামনে ধর। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে কেমন সুন্দর-ভাবে তোমার তৈরী উড়োজাহাজের ডানার মতো অংশটা উপরের দিকে উঠছে! (১৮ পাতার ছবি দেখ)

এবার একটা পিচবোর্ড ওই টেবিল পাখার সামনে এমন ভাবে ধর যেন বাতাস লুপের উপরের অংশ দিয়ে ভাল ভাবে বইতে না পারে। এবার দেখবে, বাতাস বইতে পারছে না বলে লুপটা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে — উপরে ওঠেনি মোটেই।

এরোপ্লেন কিভাবে এগিয়ে যায় তা বারনৌলির সূত্র থেকে মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম! আচ্ছা, রকেট এবং জেট-প্লেন কিভাবে এগিয়ে যায় তা জানো? নিউটনের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার



ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটনা বুঝতে হলে এই দারুণ মজার এক্সপেরিমেণ্টটা করে দেখ।

সূত্র তোমরা এতদিনে নিশ্চয়ই জেনেছ। যখনই কোনও ক্রিয়া ঘটবে সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়াও হবে। বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার সময় বন্দুকটা পিছনের দিকে ঠেলা মারে। বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে ক্রিয়া আর পিছনদিকে সমপরিমাণ যে ঠেলা মারে সেটা প্রতিক্রিয়া। জেট ও রকেট এই একই নিয়মে এগিয়ে যায়। এই এগিয়ে যাবার জন্য এদের চার-পাশের বাতাসকে কাজে লাগানোর দরকার হয় না মোটেই। রকেটের পেছন থেকে গরম বাতাস বেরিয়ে গিয়ে রকেটকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। এই মজার এক্সপেরিমেন্টটা দেখাতে হলে আমাদের চাই—একটা বোতল, ঐ বোতলে লাগাবার কর্কের ছিপি, দু'মিটার লম্বা কিছু সুতো, দুটো ড্রইং পিন দু'চামচে বেকিং সোডা, একটা কাপের সিকিভাগ ভিনেগার ও একটা ফানেল।

প্রথমে বোতলটাকে শক্ত সুতো দিয়ে টেবিলের সঙ্গে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ঝুলিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে বোতলটা যেন মেঝের থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে থাকে। এইবার বোতলের ভিতর কয়েক চামচ বেকিং সোডা ঢালো। তারপর ফানেলের সাহায্যে বোতলের মধ্যে কাপের সিকিভাগ ভিনেগার ঢেলে দাও। খুব তাড়াতাড়ি বোতলের মুখটা ছিপি দিয়ে বন্ধ করে (খুব শক্ত করে আটকাবে না কিন্তু) ওটাকে নিজের জায়গায় ঝুলতে দাও। ভিনেগার আর বেকিং সোডার বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়ে বোতলের ভিতর চাপ দেবে। এর ফলে ওর মুখের ছিপিটা সশব্দে বাইরে বেরিয়ে আসবে। এটাই হ'ল ক্রিয়া। ছিপিটা যে দিকে ছুটে যাচ্ছ, বোতলটা সরে আসবে ঠিক তার উল্টো দিকে। এটাই হ'ল প্রতিক্রিয়া।

একটা বেলুন ফুলিয়ে যদি তার বাতাসকে ছেড়ে দাও তাহলেও দেখবে বাতাসটা যেদিকে বেরিয়ে যাবে—বেলুনটা ছুটবে ঠিক তার বিপরীত দিকে। রকেট ও জেটপ্লেন এই একই নিয়মে এগিয়ে যায়।

এবার যে ছোট্ট অথচ দারুণ মজার এক্সপেরিমেন্ট আমরা করব তার সাহায্যে জানতে পারা যাবে উড়োজাহাজকে কেমন করে কন্ট্রোল করা যায়। এরোপ্লেনের বডির মোটামুটি তিনটে অংশের সাহায্যে ওটাকে কন্ট্রোল করা যায়। এগুলো হচ্ছে—এইলেরনস, (দু'পাশের দুটো ডানায় থাকে) রাডার আর এলিভেটর।

একটা পোস্টকার্ড নিয়ে সেটাকে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ভাঁজ কর। পোস্টকার্ডের একদিকে ২৫ সে.মি. লম্বা একটা শোলা আটকে দাও। মডেলটার ব্যালান্স পয়েন্ট বার করে তার মধ্যে একটা পিন ঢুকাতে হবে। এবার এলিভেটরটাকে ৪৫° কোণ করে বসাও। এখন এই লেজওয়ালা এরোপ্লেনের মডেলে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে ফুঁ দাও। দেখতে পাবে, শোলার সামনের দিকের অংশটা উপরে উঠছে, ঠিক যেমন উড়োজাহাজ উপরে উঠবার সময় তার নাকটা উপরের দিকে ওঠে। ছোট্ট একটা এরোপ্লেনের মডেল তৈরী করে তোমরা দেখতে পারো রাডার কিভাবে এরোপ্লেনকে ঘুরাতে পারে আর এইলেরন এরোপ্লেনের ডানাকে ঝুঁকতে সাহায্য করে। (২২ পাতার ছবি দেখ)

আজ ডিংকুদের বাড়ীতে হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড! বাড়ীর পাশ দিয়ে যে যাচ্ছে সেই বুঝতে পারছে একটা কিছু ঘটেছে ওদের বাড়ীতে। ছোট ছেলেমেয়েদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে!

—কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? এত হৈ-হুল্লোড়ই বা কিসের জন্য?

—বাঃ রে, তোমরা কিচ্ছু জান না, আজ যে ওদের পাইলট ছোট মামা জুরিক থেকে ফিরেছেন। পুরো সাত-সাতটা দিন উনি কোলকাতা থাকবেন। সেই সঙ্গে ভাগ্নেদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাবের ছোট্ট একটা ফকার ফ্রেণ্ডশিপ উড়োজাহাজে করে ওদের ভুবনেশ্বর নিয়ে যেতে হবে। আর ছোটমামা ফিরে যাবার আগের দিন ডিংকুকে পাশে নিয়ে গ্লাইডারে উড়বেন। এর চেয়ে বড় খবর ওদের কাছে আর কি হতে পারে? পুরো দু'দুটো বছর ধরে ছোটর দল এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে। কাজেই আজ তারা একটু হল্লা-হাসি করবে বৈকি!



মার্কুইশ দ্য বাকভিল আকাশে উড়বার চেষ্টা করছেন।

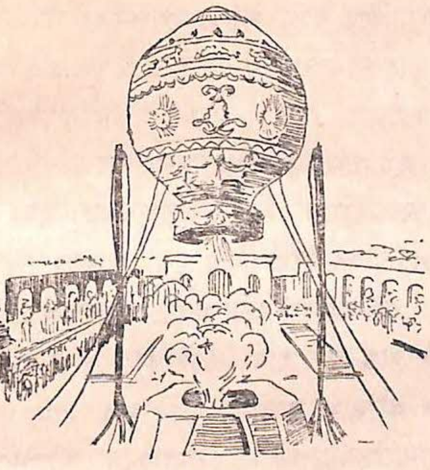
দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা ছোট মামাকে ঘিরে ধরল গল্প শোনার জন্য। মামা বললেন, কিসের গল্প বলব বলো, স্বর্গের পরীদের ?

বাবুন চিৎকার করে উঠল—না, মামা পরীর গল্প শুনতে চাইনে, আমরা আকাশে ওড়ার গল্প শুনব।

টিংকু বলল—আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছি, পিঠে দুটো ডানা লাগিয়ে আকাশে উড়ছি, কি মজা!

মিঠুন বলল—আকাশে উড়ে থাকার আসল কৌশলটা কি, আমাদের সহজ কথায় বুঝিয়ে দাও না ছোট মামা!

মামা বললেন—'ঠিক আছে, আমি বুঝাতে চেষ্টা করছি—তবে তোমরা কতটা শিখলে পরে প্রশ্ন করে তা জেনে নেব।'



মঁগলফিয়ার ভাইদের তৈরী বেলুন—১৭৮৩।

ছেলেরা গোল হয়ে মামাকে ঘিরে বসল। উনি আরম্ভ করলেন ঃ

মাছেরা সাঁতার কাটে জলে। পাখী সাঁতার কাটে আকাশে। পাখীর দেহ এমন ভাবে তৈরী যাতে সে খুব সহজে উড়তে পারে। কিন্তু মানুষের মাছের মতো পাখনা নেই, পাখীর মতো ডানাও নেই। তবু মানুষ জলে সাঁতার কাটে। আকাশেও ওড়ে। মানুষ এটা করতে পারে তার বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের কৌশল কাজে লাগিয়ে।

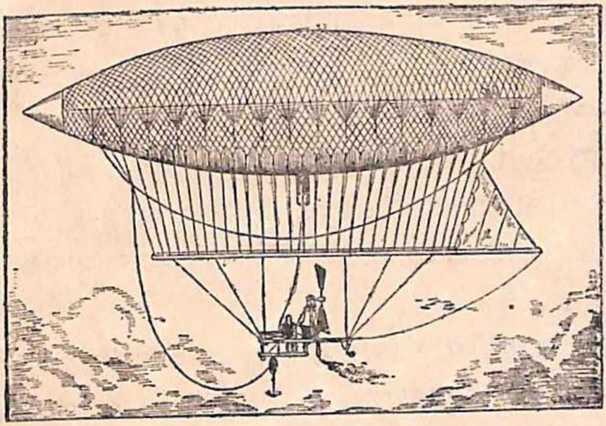
পাখী যখন মাটি থেকে আকাশে উড়তে যায় তখন সে কি করে লক্ষ্য করে দেখ। বেশীর ভাগ পাখী উড়বার আগে ডানায় ভর দিয়ে লাফ দেয় আকাশে।

তুমি হাতলওয়ালা কোনও চেয়ার থেকে উঠবার সময় তার হাতলে ভর দিয়ে ওঠো। পাখীও ঠিক সেই রকম বাতাসে ভর দিয়ে উড়তে যায়। তোমাদের মনে হতে পারে বাতাস তো আর চেয়ারের হাতলের মতো শক্ত নয়, বাতাসে ভর দিয়ে ওঠার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকছে—তাই নয় কি?

আসলে বাতাসের চাপ বা ধাক্কা যে কী ভীষণ তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। একগ্লাস ভর্তি জল নিয়ে তার মুখে প্লাস্টিকের ঢাক্‌না লাগিয়ে গেলাসটা উল্টিয়ে ধর। এক ফোঁটা জলও ঐ গেলাস থেকে মাটিতে পড়বে না। গেলাসের নীচের দিকের বাতাস উপর দিকে চাপ দিচ্ছে যে! আর সেই জন্যই তো জল পড়তে পারে না!

ডানার ঝাপ্‌টা মেরে পাখী সামনের দিকে এগিয়ে যায়। মাঝি নৌকার দাঁড় দিয়ে পিছন দিকে জলে ধাক্কা দেয়। লক্ষ্য করবে দাঁড়টাকে জলের উপর তুলে নিয়ে সে আবার পিছন দিকে জলে ধাক্কা মারে। এই ভাবে দাঁড়ের সাহায্যে জলকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে নৌকা এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ওড়ার সময় পাখীর ডানা কি রকম করে ওঠানামা করে তা তোমরা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়। সে তার ডানাকে উপর নীচ নাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

তোমরা হয়ত ভাবছ—পাখী নীচের দিকে ঝাপ্‌টা দিয়ে যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে উপরের দিকে ঝাপ্‌টা দেবার সময় তাকে নিশ্চয় পিছিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তা তো আর হয় না। আসলে পাখীর ডানার পালকগুলো এমন ভাবে সাজানো যে ডানা নীচের দিকে ঝাপটা দেবার সময় পালকগুলো একসঙ্গে জুড়ে থাকে। কিন্তু যখন সে উপরের দিকে ঝাপটা মারে



হেনরী জিফার্ডের বেলুন।

তখন ঐ সাজানো পালকগুলো সরে ফাঁক হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়। প্রথম দিকে মানুষও পাখীর মতো ডানা দেহের ছ'পাশে লাগিয়ে আকাশে উড়বার চেষ্টা করেছিল—একথা তোমাদের আগেই বলেছি। কিন্তু পাখীর ডানা করেছে প্রকৃতি। ঐ রকম ডানা মানুষ তৈরী করতে পারল না। অবশ্য ১৭৪২ সালে ফরাসী ভদ্রলোক মার্কুইশ দ্য বাক্‌ভিল হাতে আর পায়ে ডানা লাগিয়ে প্যারিস শহরের সীন নদীর উপর দিয়ে উড়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাঝ নদীতে আছড়ে পড়ে তিনি মারাত্মকভাবে জখম হন।

মানুষের দেহের ওজনও খুব বেশী। পাখীর দেহ বেশ হাল্কা। পাখীর দেহের ওজনও কম। আর তাই হাল্‌কা পাখীর ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে যত সুবিধা, মানুষের পক্ষে নকল ডানা লাগিয়ে উড়তে তত সুবিধা নেই।

বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়া অবশ্য পরে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বেলুনকে সহজে বাগে আনা যায় না। বেলুনের সাহায্যে খুশী মতো আকাশে ওঠানামা করতেও ঢের অসুবিধা।

১৮৫২ খৃস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী জিফার্ড বিরাট এক

বেলুনের সঙ্গে স্টীম এঞ্জিন লাগিয়ে দিলেন। এঞ্জিনের সামনে একটা বড় পাখা ছিল। জিফার্ডের এঞ্জিনের পাখা সামনের দিক থেকে বাতাসকে টেনে এনে ঠেলে দিল পিছনে। আর এঞ্জিন সমেত বেলুনটা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

আমরা সাঁতার কাটি এই একই নিয়মে। হাত দিয়ে জল সামনে থেকে পিছনের দিকে ঠেলে ফেলি এবং তার ফলেই দেহটা এগিয়ে যায়।

জিফার্ডের এই আকাশযানের নাম এয়ার-শিপ! তাঁর তৈরী প্রথম এয়ারশিপ ভালই চলেছিল। দ্বিতীয় এয়ার-শিপ দুর্ঘটনায় পড়ে। জিফার্ড কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

এই পর্যন্ত বলে ছোট মামা থামলেন। আর ঠিক সেই সময় ড্রাইভার রামসুক তেওয়ারী এসে জানাল—'ছোটাসাব, গাড়ী তৈয়ার'। ছোট মামা বললেন—চল, এবার আমরা ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাব ঘুরে আসি। ছোটর দল পা বাড়িয়েই ছিল। অর্ডার পাবার সঙ্গে সঙ্গে দুম দাম শব্দে লাফাতে লাফাতে তারা গাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। সবারই চোখে-মুখে একটা চাপা উত্তেজনা।

গাড়ী নিউ আলিপুর দিয়ে জোরসে ছুটে চলেছে। ছোটমামার পাশেই বসেছিল ডিংকু। উনি ডিংকুর হাতের তালুটা গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে বের করে সামনের দিকে ঢালুভাবে রাখতে বললেন। ডিংকু ঐ ভাবেই তার হাতটা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে বলে উঠল—"বুঝতে পেরেছি ছোটমামা এরোপ্লেনের ডানা বাতাসে কি ভাবে ঠেলা পায়।" ছোটমামা বললেন—কি করে বলত?

ডিংকু বলতে শুরু করল—হাতের তালুতে জোরে ধাক্কা মারার ফলে তালুটা উপরের দিকে ঠেলা মারছে। যদি আমি তালুটাকে খাড়া ভাবে মেলে ধরি তাহলে বাতাসের ধাক্কায় তালুটা ঠেলা খাবে পিছন দিকে।

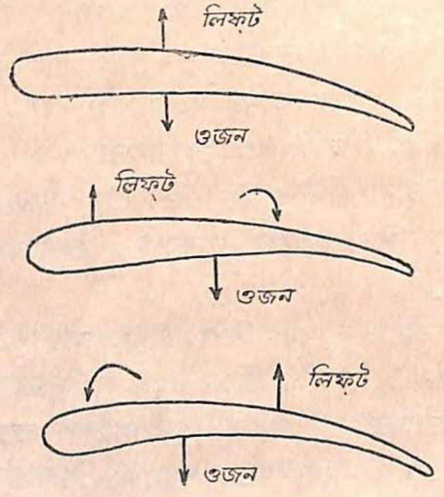
ছোটমামা বললেন—এরোপ্লেনের ডানা দুটিকে যদিও আমরা বলি

প্লেন বা সমতল তবু এরা সমতল নয়। ডানা ছুটো বাঁকানো। এরোপ্লেনের ডানা এমন এভাবে তৈরী করা হয় যাতে বাতাস বইবার সময় তার ডানায় হাতের তালুর মতো কাজ হয়। ডানাগুলির সামনের অংশ কিছুটা ঢালু করে তৈরী করা হয়। এর ফলে দ্রুত প্রবাহিত বাতাস ডানার নীচের দিক থেকে ঠেলা মারে। ডানাগুলি এই রকম উপর দিকে যে ঠেলা পায় তাকে বৈমানিকদের ভাষায় বলা হয়—'লিফ্‌ট'।

এরোপ্লেনের ডানার সামনের দিকের চাইতে যদি পিছনের অংশটা পাতলা হয় তাহলে লিফ্‌ট বেশী হবে। ওটা হবে কিন্তু এরোপ্লেনের ডানার ডিজাইনের জন্যেই। ডানার উপর অংশের দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চাপ ডানার নীচের অংশের বাতাসের চাইতে কম থাকে। এর ফলে তার ডানার নীচের বাতাস উপরের দিকে ঠেলা মারে বেশী জোরে। তার জন্যেই প্লেনটার বাতাসে ডানা মেলে ভেসে থাকতে সুবিধা হয়। এরোপ্লেনের ডানাকে ইংরেজীতে বলে—উইং।

মানুষের তৈরী যে জিনিস আকাশে উড়তে পারে তাদেরই আমরা বলি আকাশযান। এদের মোটামুটি ছু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক—বাতাসের চাইতে যারা হাল্‌কা; ছুই—বাতাসের চাইতে যারা ভারী। বেলুন, ঘুড়ি এরা বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা—কাজেই সহজেই ভেসে থাকতে পারে। কিন্তু এরোপ্লেন বাতাসের চাইতে বেশ ভারী। কোনও ভারী জিনিস টেনে তুলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। এরোপ্লেনে কি করে এই শক্তি আসে?

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম এক টুকরো লম্বা কার্ড-বোর্ড নিয়ে বাতাসে একটু হেলিয়ে ছুঁড়ে দাও। যখন ওটা বাতাসে ভেসে আছে অর্থাৎ ডানা স্থির তখন ঐ বোর্ডটার উপর ছুটো চাপ পড়ছে। একটা উপরের দিকে—এটা হচ্ছে লিফ্‌ট। দ্বিতীয় চাপকে আমরা বলতে পারি পিছুটান বা ড্র্যাগ। কার্ডবোর্ডের ওজনের জন্যই এই পিছুটান পড়ছে তা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ। উপর দিকের লিফ্‌টের শক্তি আর ওজনের জন্য পিছুটান যখন একই জায়গায় হবে



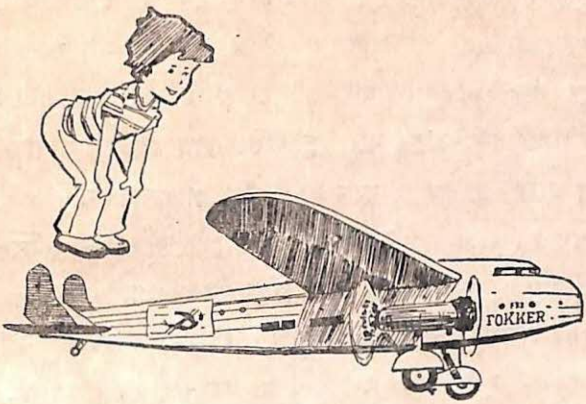
১। পিছুটানের জন্য এরোপ্লেনের ডানা স্থির হয়ে আছে।
২। সামনের দিকে লিফ্‌ট হওয়ায় ডানা পিছনে উল্টে যাচ্ছে।
৩। লিফ্‌ট পিছন দিকে হওয়ায় ডানা সামনে ঝুঁকে পড়েছে।

তখন কার্ডবোর্ডটা বাতাসে ভেসে থাকবে। কিন্তু কার্ডবোর্ডের ডানা যদি একটুও বাঁকানো থাকে তবে লিফ্‌টের শক্তি এবং ওজনের জন্য পিছুটান শক্তির জায়গা সরে যাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিতে দ্যাখো লিফ্‌টের শক্তি কার্ডবোর্ডের সামনের দিকে বা পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এটা যাতে না হয় তাই বিজ্ঞানীরা অনেক মাথা খাটিয়ে এরোপ্লেনের লেজের দিকে দুটি অনুভূমিক (Horizontal) ডানা লাগালেন। এদের আকার সামনের দুটো ডানার চাইতে ছোট। এরোপ্লেন যাতে চলবার সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে তাই এই ব্যবস্থা হলো। লেজের কাছের এই ছোট ডানা দুটির নাম—এলিভেটর। আর ডাইনে বাঁয়ে প্লেনকে ঘুরানোর জন্য পিছন দিকে যে খাড়া হাল থাকে তাকে বলা হয়—রাডার।

গ্লাইডারের গল্প

ছোটমামা বললেন—এরোপ্লেন মাটি থেকে উপরে উঠতে পারে তার নিজের জোরে। এই শক্তিটা পায় সে এঞ্জিন থেকে। গ্লাইডারে তো আর কোনও এঞ্জিন নেই। গ্লাইডার আকাশে কি করে ভেসে থাকে বলত?

ডিংকু বলল—বাতাসই গ্লাইডারকে আকাশে ঠেলা দিয়ে ওড়ায়।



ছোটমামা বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, তবে বাতাসের গতিবেগ যখন উপরমুখী—তখনই গ্লাইডার ডানা মেলে সহজে ভেসে থাকতে পারে। সব জায়গায় বাতাসের এই উপরমুখী বেগ হয় না। কাজেই সে সব জায়গায় গ্লাইডার ওড়ানোও যায় না। আগেই বলেছি, গ্লাইডারে কোনও এঞ্জিন নেই—বাতাসই একে ঠেলা মেরে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা অনেকটা দূরের আকাশে পাখীর ভেসে থাকার মতন ব্যাপার আর কি। অনেক সময় দেখা যায় খুব উঁচু আকাশে চিল, বাজ, শকুন প্রভৃতি পাখী ডানা দুটোকে শুধু মেলে ধরে মনের সুখে ভেসে বেড়াচ্ছে! তারা ডানা ঝাপটাচ্ছে না। উপরমুখী দ্রুত প্রবাহিত বাতাসই তাদের ডানা জোড়ায় ঠেলা মেরে উপরে তুলে ভাসিয়ে দেয়। গ্লাইডার ওড়ে এই একই নিয়মে!

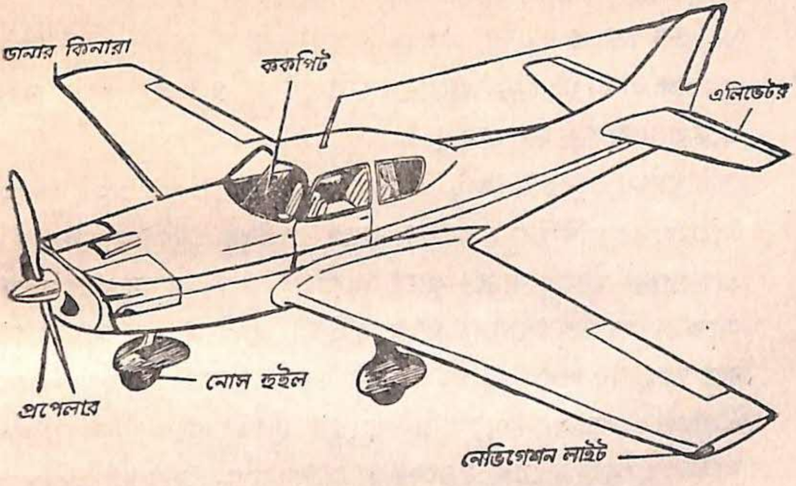
গ্লাইডারকে আমরা বলে থাকি এরোপ্লেনের পূর্বপুরুষ। ল্যানচেস্টারের তৈরী গ্লাইডারের মডেলটি ছিল দেখতে ভারী সুন্দর! এখন অবশ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার জন্যে আমরা গ্লাইডারকে আর ব্যবহার করি না। কেবল মাত্র হৈ-হুল্লোর স্ফুর্তি আনন্দের জন্য আজকাল গ্লাইডারে চেপে আমরা আকাশে উড়ে থাকি। আকাশে ওড়ার বৈজ্ঞানিক কৌশলটাও মানুষ গ্লাইডারে উড়ে বেড়িয়ে তবেই না শিখতে পেরেছে।

গ্লাইডারে চড়ে আকাশে বেড়ানো যেমন মজাদার ঠিক তেমনই রোমাঞ্চকর। এর পাইলটকেও উড়বার এবং ল্যাণ্ডিং-এর সময় তাই যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে হয়। যে ফ্ল্যাট এ্যাংগল থেকে গ্লাইডারকে ছাড়া হয় তাকে বলে গ্লাইডিং এ্যাংগল। সাধারণত এই এ্যাংগল হচ্ছে একের চব্বিশ। অর্থাৎ গ্লাইডার যদি এক মাইল উপরে থাকে (৫,২৮০ ফুট) তাহলে বাতাসে ভেসে এটা চব্বিশ মাইল যেতে পারবে। সাধারণতঃ ফ্লাইং ক্লাবে যে সব গ্লাইডার ব্যবহার করা হয় তাদের স্প্যান (ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য) প্রায় পঞ্চাশ ফুট হয়ে থাকে এবং ওজনও বেশী হয় না, চারশো থেকে পাঁচশো পাউণ্ড মাত্র। যে সব গ্লাইডার চমৎকার ওড়ে তাদের গ্লাইডিং এ্যাংগল অবশ্য একের ছত্রিশ পর্যন্ত হতে পারে। এখন সখের জন্য যে সমস্ত গ্লাইডার তৈরী করা হয় তাতে এয়ার ব্রেকের ব্যবস্থা থাকে। গ্লাইডারের ডানা এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে পাইলট ইচ্ছা মতো দ্রুত প্রবাহিত বাতাস কণ্ট্রোল করতে পারেন এবং গ্লাইড অথবা ল্যাণ্ডিং করতেও তাঁর সুবিধা হয়।

আজকাল এরোপ্লেনের মতো গ্লাইডারেও অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রাখা হয়। কত বেগে গ্লাইডার উড়ে চলেছে তার জন্য এয়ার স্পিড ইনডিকেটর, কত উঁচু দিয়ে গ্লাইডার ভেসে চলেছে তার জন্য অলটিমিটার, দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস ইত্যাদি গ্লাইডারে থাকে। এসব ছাড়া আরেক রকম যন্ত্র থাকে গ্লাইডারে তার নাম হচ্ছে ভ্যারিও-

মিটার। এটা থাকলে পাইলট বুঝতে পারেন সে আকাশে উপর দিকে উঠছে, না নীচে ডুবে যাচ্ছে।

গ্লাইডার অনেক ভাবে আকাশে ওড়ানো হয়। একটা এরোপ্লেনের পিছনে, নাইলনের শক্ত দড়ি দিয়ে গ্লাইডারকে বেঁধে ওড়ানোই সব চেয়ে নিরাপদ ও সুবিধাজনক। গ্লাইডারকে আকাশে তুলে দেওয়ার পর ইচ্ছা করলে এরোপ্লেনের পাইলট অথবা গ্লাইডারের পাইলট ঐ দড়ি সরিয়ে নিতে পারেন। দড়িটা আটকানো



প্রপেলারের তিনটি ব্লেড থাকতে পারে ; কখনও তিনটের বেশীও থাকে। জেট বিমানে কোনও প্রপেলার থাকে না। এরোপ্লেনে প্রপেলার, নোস-হুইল, ককপিট এঞ্জিন, ডানার কিনারা এরোফয়েল, বেতারযন্ত্র, ফুসেলেজ, এলিভেটর, রাডার, ডানার পিছনের অংশ, ডানার সামনের অংশ, নেভিগেসন লাইট, এরোফয়েলের নীচে ট্রাইসাইকেল চাকা এই সব থাকে। যে সমস্ত উড়োজাহাজের সামনের দিকে দুটো চাকা থাকে, সাধারণত তাদের লেজের নীচের দিকে ছোট আর একটা চাকা থাকে। ছবিতে শুধু প্রপেলার, নোসহুইল, নেভিগেসন লাইট, ককপিট ও এলিভেটর দেখানো হয়েছে।

হয় গ্লাইডারের নাকে এবং এরোপ্লেনের বদলে মোটর গাড়ীর পেছনে গ্লাইডারকে বেঁধে, তারপর মোটর গাড়ীকে সামনের দিকে জোরে ছুটিয়েও গ্লাইডারকে আকাশে তোলা যায়। এর জন্য অবশ্য ভাল রান-ওয়ে অর্থাৎ যেখান দিয়ে মোটর গাড়ীটা ছুটবে—সেই জায়গাটা ঠিক করে নিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধেও গ্লাইডার'ক নানাভাবে কাজে লাগান হয়েছে।

ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাবে পৌঁছে ছোটমামা ছেলেমেয়েদের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

ওরা তো কোনদিন এত ছোট ছোট প্লেন দেখেনি। কাজেই একসঙ্গে নানা ধরণের এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, গ্লাইডার এসব দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল!

ছোটমামা একটা ছোট্ট এরোপ্লেনের কাছে গিয়ে ওদের প্রথমে এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরোপ্লেনের মাথার সামনে আছে প্রপেলার। ওটা বন্ বন্ করে ঘুরতে থাকে। তার ঠিক পিছনেই থাকে এঞ্জিন। পাইলট যে জায়গাটায় বসে তার নাম হচ্ছে ককপিট। দুটো ডানার কিনারার দুদিকে থাকে এলরনস। ডানার একেবারে প্রান্তের দিকে থাকে নেভিগেশন লাইট। পাইলট যেখানে বসেন তার ঠিক মাথার উপর থাকে বেতার যন্ত্র। লেজের দু' পাশে এলিভেটর আর লেজের খাড়া অংশটার নাম রাডার। এঞ্জিনের নীচে এরোপ্লেনের সামনের দিকে যে চাকা থাকে তাকে বলে নোস-হুইল। ডানার দু' পাশে ট্রাই সাইকেলের মতো আরও দুটো চাকা আছে।

এরপর আরও বিস্ময়! ছোট মামা ওদের সব্বাইকে নিয়ে ঢুকলেন এরোপ্লেনে ককপিটের জায়গায়। পাইলটের সামনে একটা ডাণ্ডা দেখিয়ে বললেন এর নাম কণ্ট্রোল স্টিক। এটাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো যায়; তাছাড়া এগিয়ে ও পিছিয়ে আনাও চলে। এই স্টিকের ডান দিকে ও বাঁ দিকে দুটো পেডাল আছে। এই পেডাল দুটোর সঙ্গে রাডারের যোগ আছে।

এইবার ছোটমামা সকলকে নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে বসলেন। রামসুক ওদের জন্য আইসক্রীমের কাপ আগেই নিয়ে এসেছিল। ছোটমামা আইসক্রীম খেতে খেতে বলে চললেন :

এরোপ্লেনের প্রপেলারের কাজ হচ্ছে বাতাসকে সামনের দিক থেকে টেনে এনে পিছনে ঠেলে ফেলা। আগেই বলেছি—সাঁতার কাটবার সময় জল সামনে থেকে পিছনে কেটে আমরা এগিয়ে যাই কিন্তু এই একই নিয়মে।

এরোপ্লেনের দু'দিকে দুটো বড় পাখনা রয়েছে। এরোপ্লেনের ডানা বিশেষ ভাবে তৈরী হয়। ডানার উপর দিয়ে জোরে বাতাস বয়, ফলে তার চাপ কমে যায়। ডানার নীচের অংশের বাতাসের বেশী চাপ থাকায় এরোপ্লেন ডানা মেলে সহজেই ভেসে থাকতে পারে। ডানার এলরনস ছাড়া যে অংশ তাকে বলে এরোফয়েল।

বাবুন বলল : আকাশে তো ওঠা গেল, কিন্তু উঁচুতে ওঠা, নীচে নামা, ডানদিক বাঁদিক ঘোরা ফেরা করা, এসব কি করে হয়?

ছোটমামা বললেন—হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাও রয়েছে এরোপ্লেনে। এটা বুঝতে হলে তোমাদের প্লেনের লেজের দিকে মন দিতে হবে। লেজের খাড়াই অংশের নাম রাডার। তার দু'পাশে রয়েছে দুটো এলিভেটর। পাইলট তার খুশী মতো এই এলিভেটরকে উঁচু-নীচু করতে পারে। পাইলট যখন এরোপ্লেনকে উঁচুতে তুলতে চায় তখন সে দু'দিকে এলিভেটরকে উঁচু করে। এর ফলে লেজের দিকটায় হাওয়ার চাপ বেশী পড়ে বলে ওটা নেমে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের সামনের দিকটা উঁচু হয়ে উপরে উঠতে থাকে। ব্যাপারটা অনেকটা ঢেঁকিতে পাড় দেবার মতন কাণ্ড আর কি! তোমরা যারা গ্রামে ঢেঁকিতে পাড় দিতে দেখেছ, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে ঢেঁকির গোড়ায় পায়ের চাপ দিলে তার মুখটা কেমন উপরের দিকে উঠে আসে। আবার প্লেনটা নীচের দিকে নামার সময় পাইলট এলিভেটরকে নামিয়ে দেয়। এর ফলে বাতাস নুইয়ে পড়া এলিভেটরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করে। তখন প্লেনের

সামনের দিকটা ঝুঁকে পড়ে আর প্লেনটা নীচের দিকে নামতে থাকে।

নৌকার হালের মতো এরোপ্লেনেরও হাল আছে। সেটার নাম রাডার। রাডার ওঠা-নামা করে না, এদিক ওদিক ঘোরানো যায় শুধু। রাডার ডান দিকে ঘোরালে প্লেন ডান দিকে ঘোরে, বাঁদিকে ঘোরালে প্লেনও ঘোরে বাঁদিকে। প্লেনকে ডান দিকে অথবা বাঁ-দিকে ঘুরাবার সময় যেদিকে প্লেনটা ঘুরছে—সেদিকে খানিকটা কাত হয়ে পড়ে। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য প্লেনের ডানা দুটোর পিছন দিকে এলরনস আছে। এই এলরনস দুটো পাইলট তার ইচ্ছা মতো ওঠানামা করাতে পারে। বাঁদিকের এলরন উঠলে ডান দিকেরটা পড়ে আবার ডান দিকেরটা উঠলে বাঁদিকেরটা পড়ে। পাইলট বাঁদিকে প্লেনকে ঘুরাতে চাইলে বাঁদিকের এলরন উঁচু করবে আর তক্ষুনি ডানদিকের এলরন নীচু হয়ে যাবে। বাঁদিকে এলরন উঁচু হলো বলে এরোপ্লেনের ঐ ডানায় বাতাসের চাপ বেশী করে পড়ে। তাই প্লেনের বাঁ-দিকের ডানাটা নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের এলরন নীচু হয়েছে বলে বাতাসের চাপে ডানদিকের ডানাটা উঁচু হয়ে যায়। মনে রাখবে এলরন ওঠা-নামা করলে প্লেনটা ডান দিকে বা বাঁ-দিকে কাত হতে পারে। এলরন এক দিকেরটা উঠলে অন্য দিকেরটা পড়ে। দুটো এলরন কিন্তু কখনও একসঙ্গে উঠবে না বা পড়বে না। ঠিক দাড়ি পাল্লায় ওজনের মতন ব্যাপারটা। একদিক ভারী হয়ে নামলে অন্য দিকটা উপরে উঠবে। পাইলট তার নিজের জায়গা অর্থাৎ ককপিটে বসে এইসব পরিচালনা করেন। পাইলটের কণ্ট্রোল স্টিকের সঙ্গে এলরনস এলিভেটরের যোগ আছে। রাডার বা প্লেনের হালের যোগ হচ্ছে দুটো পেডালের সঙ্গে। পাইলট পা দিয়ে পেডালকে ঠেলা মারেন। পাইলট ডানদিকের পেডালে ঠেলা মারলে রাডার ডানদিকে ঘুরবে। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের মাথাও ঘুরে যাবে ডান দিকে।

আকাশে উড়োজাহাজ চালানোর ইতিহাসে যাঁদের নাম চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁরা হলেন—আমেরিকান দুই ভাই, অরভিল আর উইলবার রাইট। বহুদিন ধরে এই দুই ভাইয়ের



অরভিল ও উইলবার রাইট যাঁরা নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহকের মাঠে প্রথম এরোপ্লেন উড়িয়েছিলেন।

মনে বড় সাধ কি করে আকাশে মনের সুখে পাখীর মতো উড়ে বেড়ানো যায় !

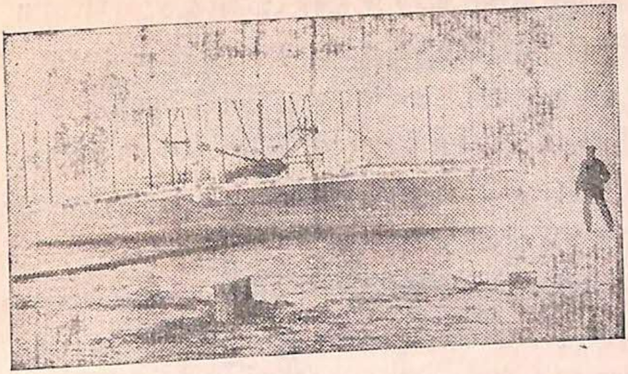
অসীম ধৈর্য, পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ছিল এই দুই ভাই-এর। এঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে উড়োজাহাজকে আকাশে ভাসানো যত সহজ, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ভারসাম্য (ব্যালান্স) বজায় রাখা তত সহজ নয় ! এ ছাড়াও উড়োজাহাজকে পাইলট যাতে নিজের ইচ্ছামতো উপর দিকে উঠাতে বা নীচের দিকে নামাতে পারে তার ব্যবস্থাও বের করা। এর পরেও পাইলটদের ভাবতে হবে উড়েজাহাজকে ডান দিকে অথবা বাঁ-দিকে কাত করার কায়দা জানা।

রাইট ভাইরা দুটো ডানাওয়ালা উড়োজাহাজ তৈরী করলেন! এর একটা ডানার উপরে থাকল আর একটা ডানা। পাইলটের কাঁধের সঙ্গে ঐ ডানা এমনভাবে বাঁধা ছিল যাতে ইচ্ছামতো দেহটাকে নাড়ালে ডানা দুটোও নড়ে ওঠে এবং তার ভারসাম্যও বজায় থাকে ! অর্থাৎ অটোলিলিয়ানথেল যেমন তাঁর অঙ্গসঞ্চালনের সাহায্যে গ্লাইডারের ভারসাম্য বজায় রাখতেন, রাইট ভাইরাও অনেকটা সেই রকম ব্যবস্থাই করলেন আর কি। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে এলরন।

উড়োজাহাজের মুখকে উঁচু অথবা নীচু করার জন্য তার সামনের দিকে উপর-নীচ দুটো ছোট পাখা রাখার বন্দোবস্ত হলো। এটাই পরবর্তীকালের এলিভেটর। যদিও এটাকে তখন তাঁরা সামনের দিকে লাগালেন, পরে বিজ্ঞানীরা সুবিধার জন্য এটাকে পিছনের দিকে জুড়ে দিয়েছিলেন। পাইলটের কাজও ছিল ভারী মজার। সে উড়োজাহাজের সামনে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে থাকবে, আর সমস্ত উড়োজাহাজের ব্যালান্স রক্ষা করবে সামনের একটা লাঠিকে নড়াচড়া করিয়ে। এব ফলে এলিভেটরকে কন্ট্রোল করা সহজ হতো। কাঁধের সঙ্গে উড়োজাহাজের ডানার যোগ থাকায় কাঁধটাকে নাড়ালে জাহাজের ডানাও এদিক ওদিক নড়বে। হালের ব্যবস্থাও রাইট ভাইরা করেছিলেন। এটাই পরবর্তীকালের রাডার। ডান দিক

অথবা বাঁ-দিক এই রাডারের সাহায্যে সহজে করা যেত। অনেক দিনের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা সত্যি সত্যি তাঁদের নিজের হাতে তৈরী গ্লাইডার ওড়ানোর কাজ সম্পূর্ণ করলেন।

আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনায় কিটিহক নামে একটা জায়গা আছে। এখানে সব সময় বাতাস খুব দ্রুতগতিতে বইতে থাকে। রাইট ভাইদের এই জায়গাটা বেশ পছন্দ হলো। তাঁরা ঠিক করলেন এখান থেকেই আকাশে পাড়ি জমাবেন। ১৯০০ সালে তাঁদের গ্লাইডার তৈরী হলো। এই গ্লাইডারে তাঁরা যে কতবার আকাশে উড়েছিলেন তা বলে শেষ করা যাবে না। এই গ্লাইডার অর্থাৎ



রাইট ভাইদের তৈরী প্রথম এরোপ্লেন যা আকাশে উড়েছিল।

এঞ্জিন বিহীন উড়োজাহাজই তাঁদের মনে আকাশ জয়ের তীব্র আশা এনে দিল। এঞ্জিন লাগিয়ে এখন তাঁরা আকাশে উড়তে পারবেন, এ বিষয়ে রাইট ভাইরা নিশ্চিত।

অবশেষে সত্যিই এঞ্জিন সমেত উড়োজাহাজ তৈরী হলো ওঁদের হাতে। প্রপেলার, এলিভেটর, রাডার—সব কিছুই এতে ছিল। এই উড়োজাহাজের নাম দেওয়া হলো—ফ্লায়ার। ১৯০৩ খৃস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর। রাইট ভাইরা তাঁদের তৈরী বাইপ্লেনটাকে নিয়ে এলেন নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহকের মাঠে।

দু'ভাইয়ের মধ্যে কে প্রথম আকাশে উড়বেন? লটারী হলো।

লটারীতে নাম উঠল ছোট ভাই অরভিলের। অরভিল উড়োজাহাজে উঠে স্টার্ট দিলেন। আকাশে মাত্র বারো সেকেণ্ড ছিল অরভিলের এই প্লেন। তারপর একশ কুড়ি ফুট দূরে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

এরপর উইলবারের পালা। তিনি তাঁর ভাইয়ের চাইতে একটু বেশী সময় আকাশে ছিলেন। প্রায় এক মিনিট। আর পথ অতিক্রম করেছিলেন প্রায় আটশ ফুট। দর্শকদের অনেকে ভাবতেই পারেনি যে সত্যি সত্যি রাইট ভাইরা আকাশে উড়তে পারবেন। তাঁদের অনেকেই মজা দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরাও অবাক হয়ে গেলেন। খবরটাও দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

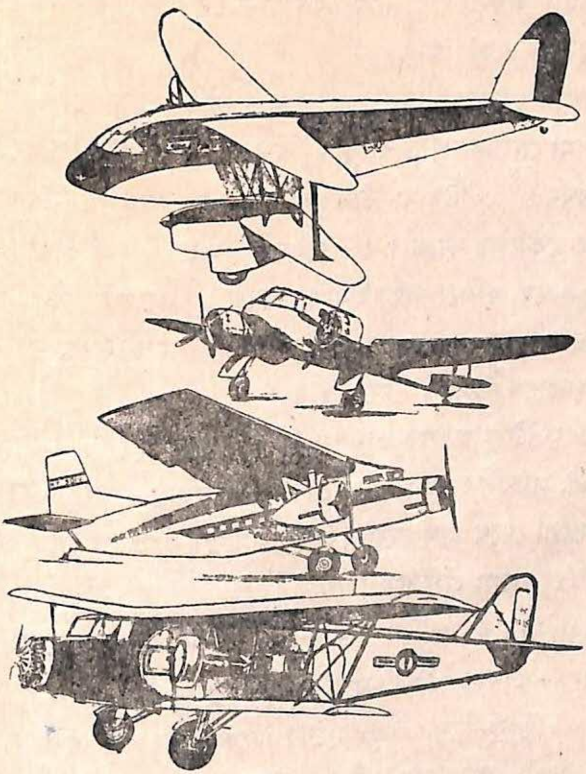
আগেই বলেছি রাইট ভাইদের প্লেনটিতে ত্ব'জোড়া ডানা ছিল। তাই একে বলা হোত বাইপ্লেন। এক জোড়া ডানাওয়ালা প্লেনকে বলা হয় মনো-প্লেন। এর আবিষ্কর্তা ফরাসী বৈমানিক লুই ব্লিরিও।

তিন জোড়া পাখা দিয়ে তৈরী প্লেনকে বলা হয় ট্রাইপ্লেন। এসব এখন আর চলে না। লুইব্লিরিও মনো প্লেনে চড়ে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন।

রাইট ভাইদের প্রথম আকাশে ওড়ার পর থেকে কত বছর কেটে গিয়েছে। মানুষ মগজ খাটিয়ে কত সুন্দর সুন্দর প্লেন তৈরী করেছে। শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে এইসব বিমান এখন ছুটে চলে!

রানওয়ে থেকে বোঁ করে আকাশে

ডিংকু-টিংকুদের কতোদিনের সাধ আজ পূর্ণ হতে চলেছে। ক্যালকাটা ফ্লাইং ক্লাবের রানওয়েতে যে ছোট্ট ফকার ফ্রেণ্ডশিপ উড়োজাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটাতেই তারা এক্ষুনি উঠবে। পাইলট হচ্ছেন ওদের প্রিয় ছোটমামা। ছোটমামা ককপিটের চেয়ারে গিয়ে



নানারকমের এরোপ্লেন

বসলেন। ডিংকু-টিংকু বসেছে ককপিটের বাইরে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে, কোমরে বেল্ট বেঁধে। ছোটমামা প্রথমে পেট্রোল মাপার যন্ত্রের দিকেতাকিয়ে দেখে নিলেনদরকার মতো পেট্রোল আছে কিনা।

তারপর সুইচ টিপে দিয়েই প্লেনের এঞ্জিনটা চালু করে দিলেন। বাইরে এখন প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। এইবার প্লেনটা রানওয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে দিল। তারপর ঘুরে এসে একটা জায়গায় গ্রীন সিগন্যালের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্রীন সিগন্যাল পেলে তবেই প্লেন আকাশে উড়তে পারবে।

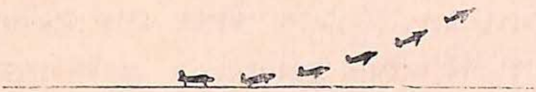
ডিংকু-টিংকু প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। কি রকম একটা শিহরণ লাগছে ওদের মনে। একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি। ঠিক যেন ডানা মেলে পাখীর আকাশে ওড়ার মতো মুক্তির একটা স্বাদ!

দেখতে দেখতে গ্রীন সিগন্যাল জ্বলে উঠল রানওয়ের দু'পাশে। ছোটমামা প্লেনের স্পীড বাড়িয়ে দিলেন। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে ওটা এখন। ছোটমামা তাঁর সামনে যে কণ্ট্রোল স্টিকটা থাকে, সেটাকে কোলের কাছে নিয়ে এলেন। আগেই বলা হয়েছে কণ্ট্রোল স্টিকের সাথে এলিভেটরের যোগ আছে। কাজেই স্টিকটা টানলে এলিভেটর উঠবে। আর এলিভেটর ওঠা মানেই প্লেনের মাথা উঁচু হয়ে আকাশে উঠবে। হলোও তাই।

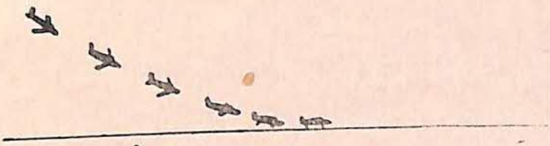
ডিংকু-টিংকু আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। নীচের দিকে ঘরবাড়ী, গাছপালা সব কতো ছোট দেখাচ্ছে। আর নীচের বিজলী বাতিগুলো দেখে মনে হচ্ছে বিশাল সমুদ্রের বুকে কে যেন রাশি রাশি প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ছোটমামার পিছনে ডিংকু-টিংকু কখন এসে দাঁড়িয়েছে। মামা বললেন—আমরা এখন মাটি থেকে কত উঁচু দিয়ে যাচ্ছি বলতে পার? ডিংকু-টিংকু এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে এমন সময় ছোট-মামা একটা গোল যন্ত্রের দিকে আঙুল দিয়ে বললেন—এটার নাম অলটিমিটার। এর থেকে উচ্চতা মাপা যায়। আমরা এখন মাটি থেকে ন'শো ফুট উঁচুতে রয়েছি।

ছোটমামা এইবার কণ্ট্রোল স্টিকটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন। এবার কি হবে বলতো? তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে



এরোপ্লেনের টেক অফ



এরোপ্লেনের ল্যান্ডিং



এরোপ্লেনের হাফ রোল

এর ফলে এলিভেটর নীচু হয়ে যাবে আর তখন বাতাস তাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে তুলবার চেষ্টা করবে। প্লেনের মাথাও তখন মুখ নীচু করে মাটিতে নামতে চাইবে।

ডিংকু-টিংকু চিৎকার করে বলে উঠল—এখন নামতে চাইনে ছোটমামা, আরও কিছুক্ষণ মজা করে উড়ব।

ছোটমামা এবার স্টিকটাকে কোলের কাছে টেনে এনে তারপর আবার মাঝামাঝি জায়গায় রেখে দিলেন। প্লেনটা প্রথমে আকাশ-মুখী হ'ল—খানিক বাদেই আবার চমৎকার ভাবে একই লেভেলে উড়তে থাকল।

মাটি থেকে প্লেন যখন আকাশে ওড়ে তখন তাকে বলে টেক-অফ আর যখন ওটা আকাশ থেকে নীচে নামে তখন বলা হয় ল্যাণ্ডিং।

আকাশে ভানুমতীর খেল

ছোটমামা সেদিন প্লেনে বসে নানান মজার খেলা দেখিয়ে ওদের অবাক করে দিয়েছিলেন। সেগুলো হচ্ছে আকাশ পথে প্লেনকে নিয়ে ভানুমতীর খেলা। কখনও হাফরোল, কখনও বা লুপ বা স্লিক রোল। (তেতাল্লিশ পাতার ছবি দেখ)

ডিংকু জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ছোটমামা, আকাশে প্লেনে করে ওড়ার সময় তোমরা পথ চিনতে পার কেমন করে ?

ছোটমামা বললেন—আমরা যখন কোনও রাস্তা চিনে রাখি তখন সেখানকার গাছপালা, বাড়ী, দোকান, সাইনবোর্ড, ক্লাব এইসব মনে করে রাখি। ভবিষ্যতে ঐ পথে চলবার সময় রাস্তার এইসব জিনিসগুলোই আবার আমাদের পথনির্দেশ করে।

সীমাহীন আকাশ পথে চলবার সময় বৈমানিকদেরও মাটির পথে চলবার মতোই কতগুলো জিনিস মনে করে রাখতে হয়। এরা হলো মধ্যদিনের রক্তনয়নকরা সূর্য, রাতের আকাশে রূপালী তারার দল, বেলাভূমি অথবা পাহাড় থেকে সাগর অভিমুখে ছুটে চলেছে আপন বেগে যে পাগল পারা নদী—এইসব। এসবই বৈমানিককে পথ-নির্দেশ দেয় যখন স্বাভাবিক আবহাওয়া থাকে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে তখন প্রকৃতির উপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। তখন বৈমানিককে নির্ভর করতে হয় আধুনিক আবিষ্কৃত নানারকম যন্ত্রপাতির উপর।

পাইলটের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ

ছোটমামা ডিংকুকে বললেন—আমি একটু আগে বেতারযন্ত্রে দমদম এয়ারপোর্টের সঙ্গে কথা বললাম। আমার এক বন্ধু ওখানে কন্ট্রোল টাওয়ারে রয়েছেন। ওঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আমি ঠিক কোন্ দিকে আছি তা বলতে। আমার বেতার-প্রেরক যন্ত্র থেকে ক্রমাগত পনের সেকেণ্ড ধরে বেতার ঢেউ পাঠালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি জানিয়ে দিলেন পশ্চিম দিক থেকে চল্লিশ ডিগ্রী পূবে আমরা রয়েছি।

ছোটমামা বলে চললেন—পাইলটদের সব সময় কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। কন্ট্রোল টাওয়ার আকাশে কত উঁচু দিয়ে বৈমানিক প্লেনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা বলে দেন। যেমন ধরো, আমি কোলকাতা থেকে দিল্লীর দিকে এগুচ্ছি দু'হাজার ফুট উপর দিয়ে। আর একটা প্লেন দিল্লী থেকে উল্টোদিকে কোলকাতার দিকে আসছে। কন্ট্রোল টাওয়ার তাকে অবশ্যই পথনির্দেশ দেবেন এক হাজার, বারশো ফুট বা ঐরকম উচ্চতা দিয়ে এগোবার জন্য। আকাশপথে এরোপ্লেন চালানোর ক্ষেত্রে এই উচ্চতা ঠিক রাখার ব্যাপারটা খুবই জরুরী সন্দেহ নেই।

পাইলটের ঠিক সামনে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র থাকে। এর নাম রেডিও কম্পাস। এরোড্রামের বেতার ঘাঁটি থেকে বেতার-প্রেরক যন্ত্রের (Radio Beacon) সাহায্যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বেতার ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যাঁরা এরোপ্লেন চালান—তাঁদের এইসব নানাধরণের বেতার ঢেউ-এর চেহারা কেমন তা আগে থেকে জেনে রাখতে হয়। পাইলটের সামনে যে রেডিও-কম্পাস যন্ত্র থাকে তার সাহায্যে ঐ Radio-Beacon যে সমস্ত বেতার ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা ধরে ফেলা হয়। এর থেকে এরোপ্লেন তার দিক নির্ণয় করতে পারে। কোনও বেতার-ঘাঁটি থেকে আকাশে



মিগ



হান্টার



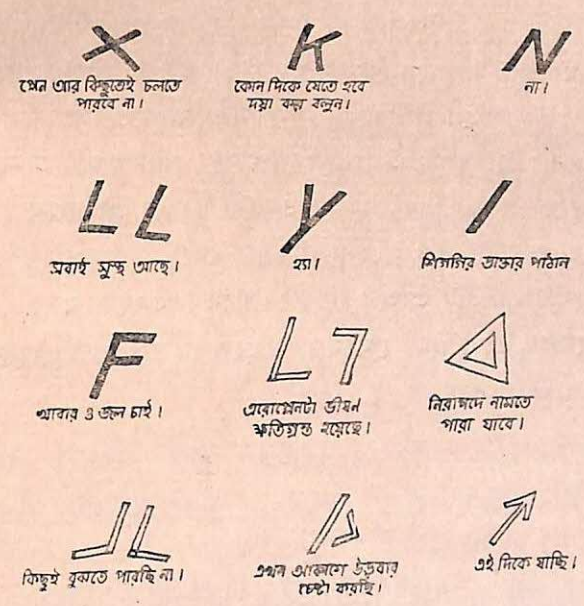
ন্যাট

এরোপ্লেনের দূরত্ব ও সঠিক অবস্থান জানা যায় রাডার (Radar) যন্ত্রের সাহায্যে। রাডার শব্দের অর্থ হোল Radio Detection and Ranging.

শহরে যেমন রাজপথ আছে—আকাশেও তেমনি রয়েছে বেতার-পথ। অবশ্য এই বেতারপথ মানুষই তৈরী করেছে। বেতার ঘাঁটি থেকে নানান ধরনের বেতার ঢেউ আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এইসব অদৃশ্য বেতার ঢেউ-এর কোনও একটা পথ ধরে কণ্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ মত এগিয়ে চলবে বৈমানিক। এরোপ্লেনের বেতার গ্রাহকযন্ত্র এই সমস্ত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বেতার ঢেউকে বন্দী করে ফেলে। তখন পাইলটের ভারী সুবিধা—ঐ নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বেতার ঢেউ-এর পথ ধরে সে এগিয়ে চলবে।

এরোপ্লেন এরোড্রামের কাছাকাছি চলে এলে ওখানকার সার্চ লাইটের সাহায্যে বুঝতে পারে সেটা কোন্ স্টেশন। এরোপ্লেন রানওয়েতে ল্যাণ্ডিং করবার সময়ও বেতার সংকেতের সাহায্য নেওয়া হয়। রানওয়ের তু'পাশে যে বেতারযন্ত্র বসানো থাকে তার থেকে যে বেতার সংকেত ছড়িয়ে পড়ে তা রানওয়ের ঠিক মাঝখানে এসে পরস্পর মিশে যায়! বাঁ-দিকের বেতার সংকেত টরে এবং ডান দিকের হলো টক্কা। এরোড্রামের কাছাকাছি এসে বৈমানিক এরোপ্লেন থেকে এক ধরনের বেতার সংকেত ছাড়েন। এই সংকেত রানওয়ের তু'ধারের বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ে। তারপর সেখানে ডাইনে-বামে টক্কা টরে সংকেত ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সংকেত ধরে বৈমানিক খুব সহজেই রানওয়ের ঠিক মাঝখানে নামতে পারেন আশ্চর্য উপায়ে।

রানওয়ের ঠিক মাঝখানে কতটা ঝুঁকে নীচে নামতে হবে তা সঠিকভাবে জানার জন্যে বৈমানিকদের আরও একধরনের বেতার যন্ত্রের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্লেনটা রানওয়ের যে দিকে নামছে তার উল্টোদিকে একটা ট্রান্সমিটার থাকে। এই ট্রান্সমিটার থেকে তু'ধরনের বেতার-ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে রানওয়েতে তু'পাশে। তার



এরোপ্লেনে যেসব সংকেত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ফলে বৈমানিক রানওয়ের মাঝখানটা ঠিক কোথায় তা পরিষ্কার বুঝতে পারেন। এছাড়া রানওয়ের লাইনটা নিরাপদে ছোঁবার জন্যে আর একটা ট্রান্সমিটার বসান থাকে মাটিতে—ঠিক যে জায়গায় এরোপ্লেন মাটি ছুঁতে যাচ্ছে তার পাশে। এই যন্ত্র দুটির সাহায্যে খুব সহজেই বৈমানিক তাঁর এরোপ্লেন নিয়ে নিরাপদে ল্যাণ্ডিং করতে পারেন। অন্ধকার রাতে ল্যাণ্ডিং-এর সময় রানওয়ের দু'পাশে আলো জ্বলে ওঠে। এর নাম Flare path—তাছাড়া এরোপ্লেনের সার্চ-লাইটও অন্ধকারে রানওয়ের উপর নেমে আসতে সাহায্য করে।

ডিংকু বলল—ছোটমামা, অনেক সময় খবরের কাগজে দেখা যায় অমুক প্লেন গতকাল থেকে নিখোঁজ হয়েছে। এই রকম প্লেন হারিয়ে যাওয়ার মানে কি? সেটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে না অন্য কোথাও নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে?

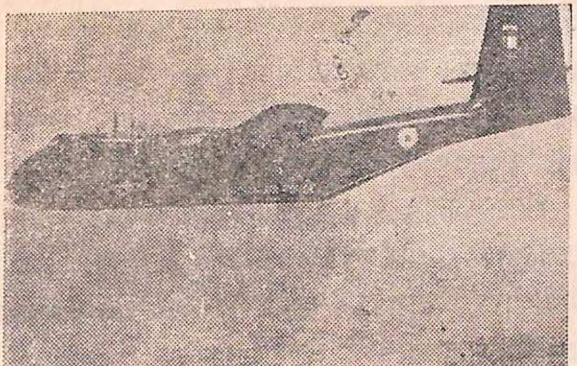
ছোটমামা বললেন—নিখোঁজ প্লেনটি দুর্ঘটনায়ও পড়তে পারে। হয়ত বা কোনও কারণে প্লেনের বেতার যন্ত্র খারাপ হয়ে যাওয়ায়

পাইলটের সঙ্গে কণ্ট্রোল টাওয়ারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে বেতার যন্ত্র ঠিক আছে কিন্তু এরোপ্লেনের এঞ্জিন খারাপ হয়ে গিয়েছে। কখনও কখনও আকাশে বড় বড় পাখী যেমন বাজ, শকুন, ঈগল এরোপ্লেনের এঞ্জিন অথবা ডানার প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া আরও নানা কারণে এরোপ্লেনকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে কোনও অচেনা জায়গায় নেমে পড়তে হয়। না হলে হয়ত আকাশেই ওটা জ্বলে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে যেত।

কোনও এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় পড়লে কতকগুলো আন্তর্জাতিক সংকেত ব্যবহার করে।

এই প্রথম ডিংকু-টিংকু ছোট্ট এরোপ্লেনে করে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটির দিকে চাইতে কি মজা লাগে! দারুণ মজা তো লাগেই এছাড়া শেখাও যায় অনেক কিছু। ছোটমামা ককপিটে বসে এরোপ্লেন চালাতে চালাতে ওদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

ডিংকু জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ছোটমামা, বাতাসের সাহায্য নিয়েই তো এরোপ্লেন আকাশে উড়তে পারে—পৃথিবীর কত উপর



বিশেষ ধরণের জঙ্গী বিমান।

পর্যন্ত এই বাতাস ছড়িয়ে আছে? ছোটমামা বললেন—পৃথিবীর পিঠের উপর রয়েছে এই বাতাসেয় স্তর। একেই আমরা বায়ুমণ্ডল বলে থাকি। বায়ুমণ্ডলের প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ রয়েছে ডাঙা অথবা সমুদ্রের পিঠ থেকে দশ মাইল পর্যন্ত উঁচু। এর নাম ট্রপোস্ফিয়ার। এই ট্রপোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে আরও চল্লিশ মাইল পর্যন্ত অঞ্চলেও বাতাস রয়েছে তবে সেটা খুবই পাতলা। এর নাম হচ্ছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার। স্ট্রাটোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে আরও প্রায় পাঁচশ মাইল

অংশের নাম আয়নোস্ফিয়ার। এখানে বাতাস নেই বললেই চলে—অক্সিজেনও খুব কম! আয়োনোস্ফিয়ার পেরিয়ে গেলে আর বাতাসের দেখা পাবে না মোটেই—এটাকে তখন বিজ্ঞানীরা আর আকাশ বলতে চান না। তারা এর নতুন নাম দিলেন মহাকাশ। মহাকাশে উড়োজাহাজ নিয়ে যাওয়া চলে না। কারণ ওখানে বাতাস কোথায়? মহাকাশে রকেট পাঠানো হয়।

এরোপ্লেন যাঁরা চালান তাঁদের বাতাসের চাপ কোথায় কত তা অবশ্যই জানতে হবে। নীচের দিকে বাতাসের চাপ বেশী, আর যতই উপরের আকাশে উঠতে থাকবে ততই বাতাসের চাপ কমবে। সাগরের উপরে বায়ুমণ্ডলের চাপ কত তা জান? সাতশো ষাট মিলিমিটার। বাতাসের চাপ যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায় তার নাম হ'ল ব্যারোমিটার। সাগর থেকে পাহাড়ে ওঠো বা আরও উঁচু পর্বতশৃঙ্গে ওঠো, বাতাসের চাপ ক্রমেই কমতে থাকবে।

পাইলটকে তাই বাতাসের চাপ কোথায় কম বা বেশী তা জানতে হবে। বাতাস পাতলা হলে সেখান দিয়ে উড়োজাহাজ চালাতে খুব সুবিধা। কিন্তু বাতাস ঘন হলে তার মধ্যে দিয়ে উড়োজাহাজ চালানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

কোনও জায়গার তাপ বেশী হলে সেখানকার বাতাসও গরম হবে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে হাল্কা। তাই গরম বাতাস উপরের দিকে উঠে যায়। ওই জায়গা থেকে বাতাস সরে যায় বলে সেই অঞ্চলের চাপও যায় কমে।

আগেই জেনেছ গরম বাতাস হাল্কা হয়ে উপরে উঠে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে কি হবে? ওই গরম বাতাস তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হবে আর সেখানে জমে থাকা ঘন বাতাসের সঙ্গে মিশে ওই এলাকায় বেশী চাপ দেবে।

তাপের সঙ্গে বাতাসের চাপ কমা অথবা বাড়ার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। বাতাসের চেষ্টাই হলো সবসময় কি করে বেশী চাপের অঞ্চল ছেড়ে কম চাপের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার ফিকির

খোঁজা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাই অনবরত বায়ুস্রোত বয়ে চলেছে। আবহাওয়াও রোজ এক থাকে না। ওটা বদলে যায়। ধুরন্ধর পাইলটকে তাই আবহাওয়ার খবর আগে থেকেই জেনে রাখতে হবে যেন পথে কোনও বিপদ দেখা না দিতে পারে। মেঘ বা কুয়াশার অবস্থাও কেমন তাও তাঁর জানা একান্ত প্রয়োজন।

আজকাল আবহাওয়া বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে যে তা বর্ণনা করাও কঠিন। ইলেকট্রনিকের দৌলতে মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন আমরা একটা স্নুইচ টিপেই জেনে নিতে পারি। তবু বলব, প্রকৃতি এত তাড়াতাড়ি বদলে যায় যে অনেক সময় অতি শক্তিশালী নিখুঁত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যেও আমরা তা ধরতে পারি না।

অনেক সময় তোমরা কাগজে পড়ে থাক—অমুক জায়গায় দারুণ দুর্যোগ আর ঝড়বৃষ্টির জন্য সেখানকার সব বিমান যাত্রা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে! হাঁা, সত্যিই তাই। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকলে পাইলট এবং অন্যান্য এরোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়াররা যদি মনে করেন এরোপ্লেন আকাশে ওড়ানোর দরকার নেই —তখন তাঁরা বিমানযাত্রা বাতিল করে দেন। ভালই করেন—কি বল, কেননা বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার দরকারটা কি?

মন মোর মেঘের সঙ্গী

এরোপ্লেন চালাতে গেলে আকাশের মেঘকেও চিনে নিতে হবে। কারণ আকাশপথে ওড়ার সময় পাইলটের সঙ্গী মেঘও তো উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে।

চার রকমের মেঘ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে। এরা হোল—১। সিরাস (Cirrus) ২। নিমবাস (Nimbus) ৩। কিউমুলাস (Cumulus) ৪। স্ট্রাটাস (Stratus)।

সিরাস মেঘের জায়গা হ'ল আকাশে—অনেক অনেক উঁচুতে। সাদা, ছেঁড়া তুলোর মতো চেহারা এই মেঘের। ভারী সুন্দর লাগে দেখতে নীল আকাশের ঠিক নীচে এই ছেঁড়া, সাদা মেঘের দল।

নিমবাস মেঘ হচ্ছে ঘন কালো। নিমবাস মেঘ দেখলেই অভিজ্ঞ লোক বুঝতে পারেন চারিদিকে মুষল ধারায় বৃষ্টি নামবে।

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে যে মেঘ সচরাচর চোখে পড়ে তা হ'ল কিউমুলাস মেঘ। স্তূপের মতো দেখতে—নীচের অংশটা বেশ কালো, এরাই হচ্ছে কিউমুলাস মেঘ। খুব ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামে স্ট্রাটাস মেঘে। সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এরা।

কোন মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন মেঘে হয় না, কোন মেঘে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে অথবা বৃষ্টি হয় তাও পাইলটকে জেনে রাখতে হয়। এটা অবশ্য একদিনে হয় না। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলেই সে এটা ভালভাবে জানতে পারে।

আগেই বলেছি প্রকৃতির চেহারা এত সহজে বদলে যায় যে তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। আকাশে হয়ত ছিল সাদা, ছেঁড়া তুলোর মত সিরাস মেঘ। আস্তে আস্তে সেখানে এসে জমলো নিমবাস মেঘ। অথবা দু'ধরনের মেঘ একসঙ্গে মিশে তৈরী করল নিমবাস কিউমিলা। সেইরকম সিরো-স্ট্রাটাস, নিমবো-স্ট্রাটাস

ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মেঘ অনেক সময় একে অপরের সঙ্গে মিশে থাকে।

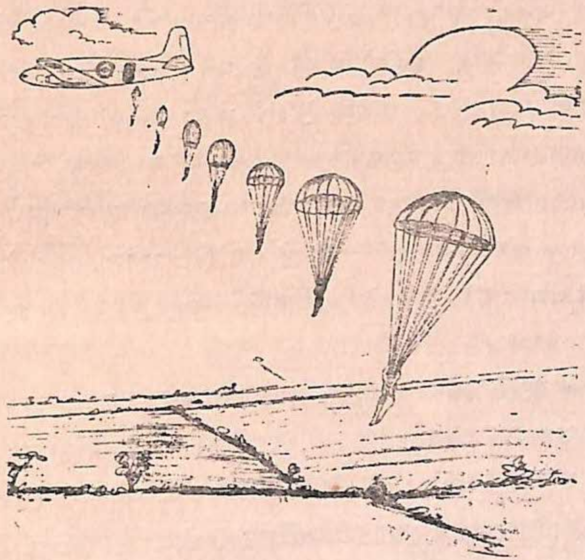
আকাশ পথে কখনও মেঘের ভেলাকে সাথী করে, কখনও নিবিড় বৃষ্টি ধারার মধ্যে দিয়ে, আবার কখনও বা ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে এরোপ্লেন চালিয়ে পাইলট তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যান। একাজে ঝুঁকি আছে নিশ্চয়, তবে আনন্দও কম নয়। পাইলট অথবা অন্য কেউ যখন আকাশ থেকে মাটিতে নির্ভয়ে লাফ দেন তখনই বা মজা কম কি!

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বৈমানিক ও বিমানযাত্রীদের রক্ষা করে যে জিনিস তার নাম প্যারাসুট বা লাইফ বেল্ট-অব-এয়ার। জাহাজডুবি হলে যেমন যাত্রীরা লাইফ বেল্ট-এর সাহায্যে জীবন বাঁচায় ঠিক তেমনি আকাশ পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বিমানযাত্রীরা প্যারাস্যুটের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করেন। লাইফ বেল্ট দেখতে গোল —অনেকটা মোটর গাড়ীর চাকার টিউবের মতো। বাতাস ভর্তি এই টিউবের উপর ভর দিয়ে বিপন্ন যাত্রীরা জলে ভেসে থাকে। প্যারাস্যুট কিন্তু আকাশে ভেসে থাকে না। ধীরে ধীরে আরোহীকে নিয়ে মাটিতে নেমে আসে। আকাশ থেকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে ঝাঁপ মারা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্যে অনেকদিন ধরে কায়দা-কানুন শিখতে হয়।

যুদ্ধের সময় বিমানকে প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে দেখা যায়। তখন বৈমানিকের বাঁচার একমাত্র অবলম্বনই হলো প্যারাস্যুট। প্যারাস্যুট আবিষ্কৃত না হলে এইসব বৈমানিকদের জীবনের কি অবস্থা হতো তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত প্যারাস্যুট ব্যবসায়ী ছিল অর্ভিং কোম্পানী। তারা একটা ক্লাব তৈরী করেছিল—'ক্যাটার পিলার ক্লাব'। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল নবীন পাইলটদের প্যারাস্যুটের সাহায্যে ঝাঁপ দিতে নিপুণ করে তোলা।

প্যারাস্যুটের ছবি তোমরা অনেকেই হয়ত দেখেছ। এটা দেখতে ছাতির মতো—তবে অনেক বড়। প্যারাস্যুট তৈরী করা হয় শক্ত সিল্ক দিয়ে। ক্যাটার পিলারের অর্থ হচ্ছে—রেশমী পোকা। ছোট্ট রেশমী পোকার উপর পাইলটের জীবন নির্ভর করে—তাই ইংল্যাণ্ডের 'ক্যাটার পিলার ক্লাবের' প্রতীক ছিল এই রেশমী পোকা। ক্লাবের সভ্যদের বুকে আটকানো থাকত এই রকম একটা ব্যাজ।



প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণ

প্যারাস্যুটের বাইরের দিকে অনেকগুলো দড়ি ঝুলতে থাকে। এই দড়িগুলো নীচের দিকে এসে একজায়গায় জড়ো হয়েছে। বিমান থেকে প্যারাস্যুটে যে লাফ মারে সে এই জায়গাটাতে বাঁধা থাকে। প্যারাস্যুটের বাইরের দড়ি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোল সিল্কের ছাতায় বাতাস ঢুকে তার মুখটা ভর্তি করে দেয়। বাতাস তখন আরোহীসুদ্ধ প্যারাস্যুটকে উপরে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টানে প্যারাস্যুট তার বাহককে নিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসে বাতাসে ভাসতে ভাসতে। ভারী মজার ব্যাপার—তাই না?

মহাযুদ্ধই বলতে গেলে প্যারাস্যুটকে শিরোনামায় নিয়ে আসে। এর আগে অবশ্য বেলুন থেকে প্যারাস্যুট পড়ে অনেকে লাফ দিয়েছে—কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নয়। মহাযুদ্ধের সময় যোদ্ধা এবং বৈমানিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তাদের বেঁচে থাকতে প্যারাস্যুট অনেকাংশে সাহায্য করতে পারে। কারণ যখন শত্রুপক্ষের বিমান এসে গুলিবর্ষণ করে অথবা বোমাবাজি ক'রে

পালিয়ে যেত তখন বৈমানিকদের লাফানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্যারাসুটের উপর নির্ভর করেই তখন অভিজ্ঞ বৈমানিক নির্ভয়ে মাটিতে লাফ মারতো। জার্মান বৈমানিকেরা জ্বলন্ত এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দেবার ব্যাপারে অতিশয় দক্ষ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্যারাসুটের সাহায্যে হাজার হাজার সৈনিকও প্রয়োজন মতো স্থানে নামান হয়েছে। এদের বলে প্যারাট্রুপস (Paratroops)। এই প্যারাট্রুপস বাহিনী খুবই দুঃসাহসিক কাজ করে থাকে, সন্দেহ নেই।

যখন সবাই বুঝল প্যারাসুট ছাড়া আকাশ-যাত্রা নিরাপদ নয়—তখনই শুরু হয়ে গেল প্যারাসুট নিয়ে ব্যাপক গবেষণা। প্যারাসুটের উন্নতি হ'ল অনেক। প্যারাসুট ভাঁজ করা অবস্থায় বৈমানিকের পিঠে আটকানো থাকে। ককপিটে বসলে এটা তার আরাম বালিশের মতো কাজ করে।

এরোপ্লেন থেকে লাফ মারার সঙ্গে সঙ্গে বৈমানিক একটা দড়ি টেনে প্যারাসুটের মুখ খুলে দেয়। এর নাম—'রিপ কর্ড'। মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারাসুট উড়তে থাকে ও আরোহীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ বৈমানিকেরা এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ মেরেই 'রিপ-কর্ড' খোলার চেষ্টা করেন না। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। ঝাঁপ মারার কয়েক সেকেণ্ড পরে ওটা খুলতে হয়।

প্যারাসুট নিয়ে এরোপ্লেন থেকে মাটিতে নামা নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা হয়েছে। প্যারাসুট আরোহীদের সত্যিকার অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়লে উত্তেজনায় গা শিউরে ওঠে।

জন ট্রানাম ছিলেন এইরকম একজন অতি বড় দক্ষ প্যারাসুট আরোহী। তাঁর সাহস ও দক্ষতার তুলনা মেলা ভার; এখনও প্যারাসুট অভিযাত্রীদের সামনে জন ট্রানামের কথা উঠলে সকলের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। ট্রানামকে বলা হতো প্যারাসুট প্রিন্স।

ট্রানামের সময় অনেকে ভাবত দুর্ঘটনায় না পড়লে বৈমানিককে

প্যারাসুট নিয়ে আকাশ থেকে লাফ মারবার প্রয়োজন হয় না! কিন্তু ট্রানাম ছিলেন একেবারে অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। তাঁর কাছে জীবন ছিল 'পায়ের ভৃত্য—চিত্ত ভাবনাহীন'।

একবার এক বন্ধু ট্রানামকে তাঁর ছোট্ট গ্রামে নিমন্ত্রণ করেন। ট্রানাম সোজা পথে না গিয়ে এরোপ্লেন থেকে সুটকেশ হাতে করে প্যারাসুটের সাহায্যে ঐ গ্রামে লাফ দিলেন! ট্রানামের এই রকম কাণ্ড-কারখানা দেখে বন্ধু-বান্ধবেরা একেবারে অবাক হয়ে যেত।

ট্রানাম একবার স্থির করলেন অন্ধকার আকাশ থেকে দু'হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে মাটিতে নামবেন। এ কাজ করতে গিয়ে অবশ্য তাঁকে বেশ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দৈবক্রমে সেবার তিনি অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

এক রেলব্রীজের উপর থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফ মেরে তিনি রেকর্ড করেছিলেন। ঐ ব্রীজটা ছিল নদীর তলা থেকে মাত্র দেড়শ ফুট উঁচু।

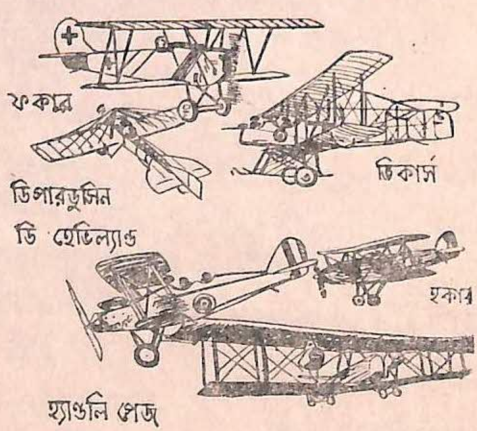
ট্রানাম কুড়ি হাজার ফুট উপর থেকে লাফ দিয়ে মাটির থেকে মাত্র হাজার ফুট উপরে এসে প্যারাসুট খুলে আর এক নতুন রেকর্ড করেছিলেন।

যদিও ট্রানাম প্যারাসুট নিয়ে এই রকম আর একটা লাফ মারতে গিয়ে তাঁর প্রাণ হারান—তবু জন ট্রানামের নাম প্যারাসুটের সঙ্গে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

চিঠি পৌঁছানো আর ফটো তোলা

আজকাল এরোপ্লেন থাকায় আমাদের কতোই না সুবিধে হয়েছে। হুস্ করে হিল্লী-দিল্লী চলে যাচ্ছি আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টায়। আগেকার দিনে এত তাড়াতাড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব হতো না। পাল্কী বা গরুর-গাড়ীতে করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে কতো সময় লাগত তা একবার ভেবে দেখ!

ধর, তুমি কোলকাতা থেকে তোমার বাবাকে লণ্ডনে একটা চিঠি পাঠাবে। চিঠিটা খুবই জরুরী। ব্যস—কিছু ভাবনা চিন্তা না করে তুমি তোমার চিঠির খামে এয়ার-মেলের টিকিট লাগিয়ে দাও। তাহলেই হোল—চিঠিখানা পাখনা মেলে উড়ে খুব তাড়াতাড়ি লণ্ডনে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে যাবে। এয়ার-মেল সার্ভিস হওয়াতে আমাদের আজ কত সুবিধে হয়েছে যে তা বলে শেষ করা যাবে না। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ চিঠি, পার্সেল, গ্রিটিংস কার্ড—আরও কত কি এয়ার-মেল সার্ভিসের দৌলতে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে।



নানা ধরণের প্রাচীন বিমান।

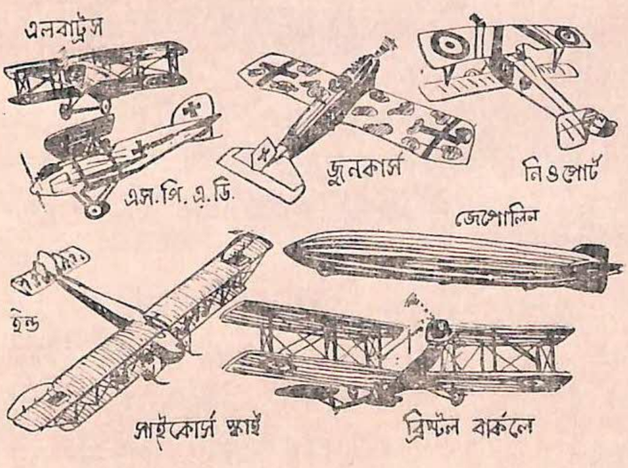
ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম এয়ার-মেল সার্ভিস চালু হয় ১৯১০ খৃস্টাব্দে। গ্রেহাম হোয়াইট নামে একজন ভদ্রলোক ব্লাকপুলের উপর থেকে চিঠি বিতরণ করেন অবশ্য বেসরকারী ভাবে। ভারী মজার ব্যাপার এটা তাই না?

ভারতবর্ষে এয়ার-মেল সার্ভিস চালু হয়েছিল ইংরাজদের রাজত্ব কাল থেকেই।

এ ছাড়া এরোপ্লেনের সাহায্যে আজকাল হামেশাই আকাশ থেকে ফটোগ্রাফ নেওয়া হচ্ছে। আকাশ থেকে নেওয়া ছবি দেখে এখন অবশ্য কেউ আর অবাক হয় না—এসব এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আকাশ থেকে প্রথম ছবি তোলা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় একশ' পঁচিশ বছর আগে। ন্যাদার নামে ফ্রান্সের একজন লোক বেলুন থেকে প্যারী শহরের কয়েকটি সুন্দর দৃশ্য তুলেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের গতিবিধি সঠিক ভাবে জানবার জন্য আকাশ থেকে অজস্র ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে। আজকাল টেলি-ফটোলেন্সের সাহায্যে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের ছবি সহজেই আমরা তুলতে



নানা ধরণের প্রাচীন বিমান।

পারি। এ ছাড়া সিনেমা, টেলিভিশনে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়নাভিরাম রঙ্গীন দৃশ্য তোলাও হচ্ছে। ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতের মাটিতে কোথায় খনিজ-পদার্থ আছে তা আকাশপথের ফটোগ্রাফ থেকে বুঝতে সুবিধা হয়। কোনও জায়গার সঠিক মানচিত্র তৈরী করতেও আকাশ থেকে তোলা ছবি খুব কাজে আসে।

দক্ষ বিমান চালকরা আকাশ পথে এরোপ্লেন নিয়ে কত রকম ডিগবাজী খেয়ে আমাদের অবাক করে দেন। এরোপ্লেনের যন্ত্রের উপর যথেষ্ট কন্ট্রোল না থাকলে এই ভেল্‌কিবাজী দেখানো যায় না।

সুপার চার্জারের গল্প

গায়ের জোরে বেশী দাঁড় ঠেলতে পারলেই সে বড় মাঝি হয় না। বড় মাঝি হতে হলে জল চেনা চাই। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে নৌকা পড়লে দেখা যায় মাঝি নৌকাটাকে কিনারা থেকে অনেক দূরে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে ফেলেছে। যারা জল চেনে না তারা এতে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেবে—মাঝি কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে নৌকাটাকে ক্রমেই গভীর জলে নিয়ে যাবে। কারণ সে জানে জল যত গভীর, উদ্বেলতা তার তত কম।

আকাশ পথে যারা চলে সেই ব্যোমযান যাত্রীদের পক্ষেও ঠিক ঐ একই কথা—বাতাস চেনা চাই। ভূ-পৃষ্ঠের যত কাছে থাকা যাবে বায়ুর চাঞ্চল্য হবে ততই বেশী। দু'হাজার পাঁচশ ফুট উপরে বায়ু বড়ই উদ্বেল ও অস্থির। ছয় হাজার থেকে দশ হাজার ফুটের মধ্যে বায়ুমণ্ডল অনেকটা অচঞ্চল ও স্থির। কাজেই মাঝ নদীর ভিতর দিয়ে গেলে যেমন স্রোত ও তরঙ্গের উচ্ছ্বাস কম, তেমনি এই দশ হাজার ফুট উপরের বায়ুমণ্ডল দিয়ে বিমান চালালেও ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

আকাশের খুব উঁচুতে, পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ৬½—৭ মাইল উপরে প্লেনের এঞ্জিনগুলো ঠিকমতো কাজ করতে চায় না। সেখানে বায়ুর চাপ খুবই কম, কাজেই সিলিণ্ডারে দমকা হাওয়াকে ঘিরে রাখবার জন্যে এঞ্জিনে একটা সুপার-চার্জার (Super-Charger) ফিট করে নিতে হয়।

একবার যুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চারজন আমেরিকান বোমারু বিমান এগারোটা জাপ প্লেনকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছিল! বোমারু বিমানগুলি পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠে অদম্য শক্তিতে জাপানীদের 'Zero' বিমানগুলিকে আক্রমণ করে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাতটি জাপানী যুদ্ধ-

বিমান আকাশের খুব উঁচুতে ওঠার দরুণ তাদের কার্যক্ষমতা হারিয়ে আগুন লেগে নীচে পড়ে যায়। বাকী চারখানা বিমান বেগতিক দেখে লেজ গুটিয়ে যায় পালিয়ে।

আমেরিকান প্লেনের এটা সম্ভব হয়েছিল তার প্রধান কারণ হলো টার্বো-সুপার-চার্জারের (Turbo-Super-Charger) কৌশল। কোনও মানুষ সাধারণতঃ পনের হাজার ফুট উপরে উঠলে যেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ঠিক তেমনি টার্বো-সুপার-চার্জার ছাড়া একটা বিমানও বেশী উপরে উঠলে অচল হয়ে পড়ে যাবে। বিমান চালকের পক্ষে অক্সিজেন যে কাজ করে—প্লেনের পক্ষেও সুপার-চার্জার ঠিক সেই কাজ করে। প্লেনখানি সাতশো ফুট উপরে যে স্বাচ্ছন্দ্য পায়—এই সুপার-চার্জারের জন্যে সাত মাইল উপরেও সে সেই স্বাচ্ছন্দ্যই পেতে পারে।

সুপার-চার্জারের ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই: এরোপ্লেনের এঞ্জিনটাকে এমন ভাবে বোকা বানানো হয় যাতে সে ভাবে সমুদ্রের লেভেলেই রয়েছে। Dr. Moss যিনি এই সুপার-চার্জারের আবিষ্কর্তা তাঁর কথায় বলতে গেলে—'the engine is fooled into thinking it as if it is at sea-level' এঞ্জিনটাও কি আশ্চর্য হবার মতো তাই ভাবে। এঞ্জিনের এক্সহস্ট থেকে অগ্নিশিখার ঘূর্ণিপাক খাইয়ে টার্বাইন দিয়ে কম্প্রেসরটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

অবিশ্বাস্য কিন্তু অলৌকিক নয়

এসো, উর্ধ্ব গগন থেকে ছ'হাজার ফুট নীচে আমরা নেমে আসি। মেঘলোকের পাশ দিয়ে, রামধনুর কোল ঘেঁসে, বিচিত্র বিচিত্র দেশ ও গিরি পর্বতের উপর দিয়ে ব্যোমযানে পাখীর মতো উড়ে যাওয়া কল্পনার দিক দিয়ে খুবই সুন্দর সন্দেহ নেই। ঝড়-ঝঞ্ঝা ছাড়াও অনেক মারাত্মক রহস্যময় ইন্দ্রজাল বিস্তৃত রয়েছে এই আকাশ পথে। একজন বৈমানিকের নিজের কথায় শোন ঃ

"আমরা মধ্য আফ্রিকার উপর দিয়ে যাচ্ছি। নীচে বকের মতো লম্বা ঠ্যাংওয়ালা মানুষ—বিল. ঝোপ, জঙ্গল। একটা বন্য হাতীর পাল চলেছে মন্থর গতিতে। এরোপ্লেনের শব্দে তাদের যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু এদিকে যে একটা কালো মেঘের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি—সে খেয়াল করিনি কেউই। একটা ধূম্রজাল ঘুরে ঘুরে উপরের দিকে আসছে। মনে পড়ছে আরব্য উপন্যাসের জেলে, মাটির কলসী, ধূম্রজাল আর সেই ভূতের ছবি !

অলটি-মিটার (উচ্চতা মাপক যন্ত্র)—এর দিকে তাকিয়ে দেখি, কাঁটা আট হাজার, ন-হাজার ক্রমে দশ হাজার ফুটে এগিয়ে যাচ্ছে। ধূসর বর্ণের বাষ্পজাল প্লেনের পাখায় যাচ্ছে জড়িয়ে। চিবুকে যেন শীতল কর-স্পর্শ। হঠাৎ প্লেন-খানা কাত হয়ে পড়ল। নীল একটা আলো যেন আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্লেনখানা পাঁচশো ফুট নীচের নেমে গেছে তখন। অয়্যারলেসে খবর নেওয়াও সম্ভব নয় কারণ ওটা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছে। এক ঝলক বিদ্যুৎ জানালার উপর দিয়ে খেলে গেল—প্লেনে লাগল একটা ঝাঁকুনি। আমরা এ ওর গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। অভ্রের আবরণ দেওয়া জানালার উপর সঙ্গে সঙ্গে লাগল একটা দমকা বাতাসের ধাক্কা—কে যেন নির্মম হস্তে আমাদের ঝাঁকুনি দিচ্ছে !

এটা যেন অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনা—এর মধ্যে যেন মানুষের অজানা কোনও রহস্য বিদ্যমান !

বজ্র মেঘের মধ্যে পড়লে কি অবস্থা হয় আর একজন বিমান-যাত্রীর বর্ণনায় আমরা তা জানতে পারি ঃ

"পাইলটের সামনে দেখা দিল একখানা বজ্র-মেঘ। প্লেনটা ছুটে চলেছে তখন ঘণ্টায় চারশো মাইল বেগে। মেঘের সহস্র কালো বাহু যেন ঘিরে ফেলল প্লেনটাকে। পাইলট তখন দিশাহারা—কি করবে সে ? কে যেন তাকে ইন্দ্রজাল করছে—মতিচ্ছন্নের মতো সে ঢুকিয়ে দিল তার প্লেনের সম্মুখ ভাগ সেই মেঘ-রাক্ষসের করাল গ্রাসের মধ্যে। প্লেনখানা যেন একটা গভীর তমসাচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে নেমে গেল। চতুর্দিক অন্ধকার। একটা অস্বাভাবিক ধাক্কা মেরে প্লেনখানা যেন উপরের দিকে ছুটছে। অনেক চেষ্টা করে ইনডিকেটরের উপরের আলোটা জ্বেলে চালক সভয়ে দেখল –সেই অন্ধকারের মধ্যে মিনিটে চৌদ্দশ' ফুট গতিতে কে যেন তাকে ছুটিয়ে দিয়েছে। প্রাণপণ শক্তিতে সে স্টিক-টা চেপে ধরে সামনের দিকে ধাক্কা দিল। এমন অবস্থায় প্লেনটার নেমে আসবার কথা—কিন্তু দেখা গেল সেটা তখনও উপরে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে প্লেনটা কাৎ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে বেরিয়ে এল যেন একটা দুর্দান্ত রাহুর গ্রাস থেকে।'

একবার সিনেমার ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে রোডেশিয়ার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উপর দিয়ে প্লেন চালিয়ে যাচ্ছিলেন স্যার এলাম কভাম। জলপ্রপাতের খুব কাছে তাঁর মনে হলো প্লেনখানাকে কে যেন টেনে ধরেছে। অনেক চেষ্টায় এবং স্থির-মস্তিষ্কের বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান।

একবার বিখ্যাত বিমান চালক উইলিয়াম জে, ম্যাকিন কায়রো থেকে খার্তুম যাচ্ছিলেন। পথে– 'Valley of Kings'-এ এলেই তার ওয়্যারলেস আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। অনেক বৈমানিক ফ্যারাওদের সমাধি স্তম্ভগুলির উপর দিয়ে চলবার সময়ও ঠিক এই অবস্থা লক্ষ্য করেছেন।

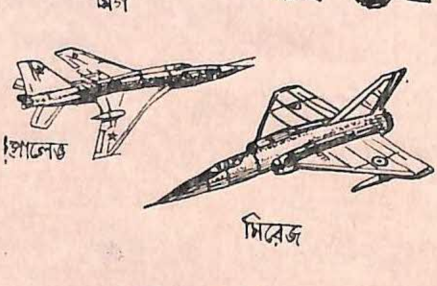
যাঁরা বিমান চালান তাঁরা অনেক সময় বলেন পৃথিবীর যেমন অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি নে, আকাশ পথেও তেমনি রহস্যময় ইন্দ্রজালের অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রেও সেক্সপীয়রের সেই অমর বাণী আমাদের মনে করিয়ে দেয়—'There are more things in heaven and earth that your philosophy can't discover'। তবে কোনও কিছুই অলৌকিক ভাবে হতে পারে না। এর নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়াও অসম্ভব নয়।

চালকহীন আকাশ যান

মনে কর, এক্ষুনি তোমার মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে চারটে ইঞ্জিনওয়ালা বিরাট একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। কেউ যদি তোমাকে বলে ওটার নাম—'ফ্লাইং ফোরট্রেস' (Flying Fortress) আর ওর মধ্যে কোনও পাইলট নেই তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে—কি বল ? না, ভয় পাবার কিছু নেই—বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পাইলটবিহীন এরোপ্লেন এখন দিব্যি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোনও ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ওটা নয় মোটেই !

এই ফ্লাইংফোরট্রেস বিমানে থাকে অনেকগুলো রেডিও-রিসিভার যন্ত্র। এদের কেউ প্লেনটাকে মাটির উপর দিয়ে ছুটিয়ে নেয়, কেউ আবার ইনফ্রা-রেড ফটোগ্রাফির সাহায্যে শত্রু এলাকার সমস্ত ছবি তুলে নেয়, কেউ আবার প্লেনটাকে কখনও কাৎ করে, কখনও আবার সোজা করে দেয়—এই সব।

মাটি থেকে কন্ট্রোল রুমে বসে পাইলটবিহীন প্লেনকে বেতার-সংকেত দিয়ে আকাশে খুশীমতো ওড়ানো, আবার যথারীতি নীচে নামিয়ে আনাও সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই অবিশ্বাস্য—তাই না ?

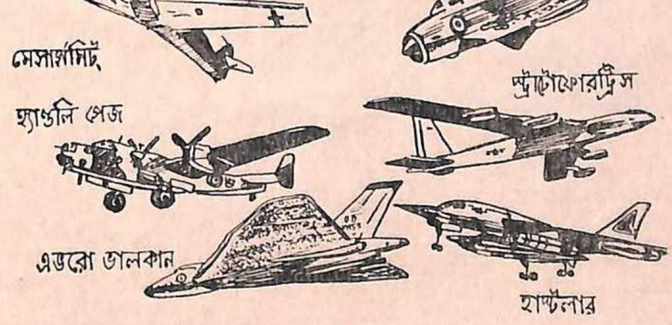


আধুনিক যুদ্ধ বিমান

যুদ্ধ বিমান

যে সব বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তারা প্রচণ্ড জোরে উড়তে পারে। গতিবেগই হচ্ছে তাদের প্রধান বিশেষত্ব। সেকালের যুদ্ধ আর একালের যুদ্ধ এক নয়। এখন ধা করে শত্রুসৈন্য আকাশ পথে কোথা দিয়ে এসে তুম করে বোমা ফেলে পালিয়ে যাবে—তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

'ডেস্ট্রয়ার'—নামে যুদ্ধ বিমানে বৈমানিক একটা আলাদা কেবিনে বসতে পারে। যুদ্ধের সময় এই সমস্ত বিমানকে আকাশে বহু উঁচু দিয়ে—প্রায় নয়-দশ মাইল বা তার চেয়েও বেশী উপর দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। তাই এখানে প্লেন চালানোর জন্য বৈমানিক অক্সিজেন ও নানারকম সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে থাকেন। খুব পাতলা ধাতু দিয়ে এই 'ডেস্ট্রয়ার' বিমান তৈরী হয়। এর এঞ্জিন খুব শক্তিশালী—প্রায় আড়াই হাজার অশ্বশক্তিরও কিছু বেশী।



আধুনিক যুদ্ধ বিমান

উড়োজাহাজ সঙ্গে নিয়ে যায় যে সমস্ত বড় বড় জাহাজ তাদের বলা হয়—এয়ার ক্রাফট ক্যারিয়ার। প্লেনগুলো সহজেই এই জাহাজের ডেকের উপর ওঠা-নামা করতে পারে। এজন্য জাহাজেই রান-ওয়ে থাকে। জাহাজখানা তাহলে কি পেল্লাই তা বোধহয় তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ।

পুরনো ও আধুনিক কালের কয়েকটি বিখ্যাত যুদ্ধ-বিমানের নাম দেওয়া হোল।

ফকার ডি—৭	স্পিট ফায়ার
ডিপার ডুসিন	মেসারস স্মিট-১০৯
ভিকারস এফ বি—৫	বি এ সি লাইটনিং
অ্যালবাট্রস—ডি-১১১	মিগ ২১ পি এফ
জানকারস ডি-১	ম্যাকডোনেল এভ-১০১
নিউপোর্ট-১৭ সি	হ্যালিফাক্স-৬
এস. পি. এ. ডি	বোয়িং স্ট্র্যাটা ফ্রেট্রেস
ব্রিসটল-৯০	টুপোলেভ টু-২০
জেপলিন—আর	মিরেজ-৪
ডি হ্যাভি ল্যাণ্ড—	হাস্টলার
হ্যানডলে পেজ-০/৪০০	এ্যাভ্রো ভালকান

দূরকে করেছ নিকট বন্ধু

মানুষ আজ মাটি থেকে আকাশে উঠছে আবার আকাশ থেকে মাটিতেও নামছে অনায়াসে। দূরকে সে নিকট বন্ধু করেছে—আবার আকাশ ফুঁড়ে মহাকাশে চাঁদের বুকেও রকেটে করে মানুষ পৌঁচেছে। হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে এ্যাঙ্গলো-ফ্রেঞ্চ কনকর্ড, ডগলাস ডি সি-১০, বোয়িং-৭০৭, ৭৪৭, টুপোলেভ ১৪৪, ভি সি-১০, করনাডো, হকার সিডেলে টিডেণ্ট পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষকে তার প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সব দেশেই আজকাল রয়েছে এয়ার লাইন্স—যেমন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স, সুইস এয়ার ওয়েস, বৃটিশ এয়ার ওয়েস, লুফথানসা, প্যান-এ্যাম ইত্যাদি। এইসব আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসের চিহ্নও প্রত্যেকের আলাদা। জুলে ভার্ণে যখন 'এ্যারাউণ্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেস' (Around the world in eighty days) লিখেছিলেন তখন সকলে ভেবেছিল ওটা নিছক কল্পনা মাত্র, সত্যিকার বাস্তবে কি আর কখনও তা রূপায়িত হবে! কিন্তু আজ আর আমরা সে কথা মনে করি না! ঈশ্বর আমাদের পাখীর মতো ডানা দেননি সত্যি—কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তার বদলে যে এরোপ্লেনের ডানা দিলেন তার মূল্যও কি কিছু কম!